মেঘপাতাল

কিন্নর রায়

মমতা প্রকাশনী
১১, পারমার রোড
ডাকঘর : ভদ্রকালী
জেলা : হুগলী

সৌমিত্র লাহিড়ীর জন্যে

লেখকের অন্য বই

উপন্যাস

কাছেই নরক

প্রকৃতি পাঠ

অন্ধকারের ছবি

আগুনের সিঁড়ি

নিরপেক্ষ

যক্ষ

সংখ্যালঘু

সংঘর্ষ

বালিঘড়ি

পূর্ণযাত্রা

যে লেখার সিরিয়াল হয় না

ছায়াতরু

গল্প সংকলন

রথযাত্রা

অন্যধারার গল্প

ধর্মসংকট

কুয়োশাওয়া ভিজে যাচ্ছে

এনটারটেইনমেন্ট আওয়ার

কিন্নর রায়ের ছোট গল্প

অরূপ-কথা

জ্যোৎস্নায় শঙ্খচিল

তুলসিচরিতমানস

ছোটদের জন্যে

আলেকজাণ্ডারের বর্শা

টুলকির গল্প

তোতামিয়া

তেণ্ডুলকারের জুটি

ভূতের গন্ধ

রম্যরচনা

লুপ্তজীবিকা

কলকাতার পাখি পোষা মাছ ধরা

ভোটের ছড়া ও অন্যান্য

ভাঙা বন্দুকের গান

লুপ্তকথা

'এই পুবমুখী অভিযানের কোনও একটি মাত্র কারণ নির্দিষ্ট করা মুশকিল। দলমার অবস্থার অবনতি, তার সঙ্গে মেদিনীপুর বাঁকুড়ার জঙ্গলের উন্নতি। সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে আবাসস্থল প্রসারণের প্রয়াস, এবং নতুন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ার একটা সহজাত প্রবণতা—সব কটাকেই হিসাবের মধ্যে আনতে হয়। জঙ্গলে খাদ্যের অভাবের কথা নিশ্চয়ই বলব, কিন্তু তার সঙ্গে এটাও মনে রাখব যে শীতের হাতির প্রধান খাদ্য সমতল ভূমির মাঠের শস্য। জঙ্গল শুধু দিনে বিশ্রামের জায়গা। দলমা ও তার পার্শ্ববর্তী পশ্চিমবাঙলার জঙ্গল নিয়েই এদের হোমরেঞ্জ বা সারা বছরের আবাসস্থল। বরাবরই এটা হয়েছে। 'দলমার হাতি' কথাটার কোনও অর্থ নেই। হাতিকে বল আমার তোমার / হাতি কি কারো কেনা? যতই হাতিদের 'লেবেন্সরাউম' বা জীবনধারণের জায়গা দরকার হোক, তাদের তো আর তা বলে কলকাতায় আসতে দেওয়া যায় না।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

'মেঘপাতাল'-এর পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ বেরল। কথাসাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বইটি পুরো পড়ে প্রয়োজনীয় কিছু কিছু জায়গা সংশোধন করে দিয়েছেন। 'এলিফ্যান্টবয়' সাবু বিষয়ে তথ্য দিয়েছেন 'আজকাল'-এর দেবাশিস মুখোপাধ্যায়। তাঁদের দুজনের মূল্যবান পরামর্শই আমার কাজে লেগেছে।

ব্রহ্মপুর
কলকাতা-৭০০০৯৬

কিন্নর রায়

'মেঘপাতাল' শব্দটি সুবিমল শিখেছিল মেদিনীপুরে ডি এম থাকার সুত্রে। সুবর্ণরেখার কাছাকাছি ওড়িশা বর্ডারে আকাশকে কোথাও কোথাও বলে মেঘপাতাল—সুবিমল এমনটি জেনেছিল। আর এখন এই ঘনিয়ে আসা শেষ ডিসেম্বরে, অন্ধকারে দূর মাঠের ভেতর কালো কালো, ঠিক কালো নয় হয়ত—মাটি রঙের পাহাড় যেন বা, চলতে-ফিরতে দেখতে পেল সুবিমল। গজেন্দ্র-গমনে—ব্যাকরণ বই অনুযায়ী যাকে কিনা ডুলকি চালে বলা যেতে পারে, বলা যেতে পারে কি? সুবিমল খানিকটা সংশয়ে থাকে। ডুলকি চাল বললে বুঝি-বা ঘোড়ার চলার ছন্দ ফুটে ওঠে। ঠিক সেভাবে নয়, পাহাড় পাহাড় হাতিরা বুঝি ধেয়ে-পেয়ে আসছে। এই ধেয়ে-পেয়ে শব্দটি আবার ঢাকা জেলার। সুবিমলের মামার বাড়ি ছিল ঢাকায়। সেই বাড়ি থেকে আসা কিছু শব্দ, মায়ের কাছ থেকে শোনা, নাকি দিদিমার কাছে—সুবিমল এখনও ঠিক মনে করতে পারে না, তবু স্মৃতিতে থেকে যায়।

হাতঘড়িতে রাত আটটা। পেছনে মশালের আলো আর পটকার আগুন শব্দ রেখে এগিয়ে আসছে হাতিরা। শীতের আকাশে এক কণা মেঘ নেই। অজস্র তারার ঝিকিমিকি। সুবিমল দেখতে পেল দলমার দামালেরা ধনেখালি থানার বেইতার মাঠে দাঁড়িয়ে। এমন তো সিনেমাতে হয়। প্রায় কুড়ি হাত দূরে দাঁড়িয়ে সুবিমল সেন, জেলাশাসক হুগলি এমনটি ভেবে নিতে পারল। হুগলি থেকে বাঁকুড়ায় ফেরান দরকার হাতির দলটিকে। চল্লিশটি হাতি পরপর—যেন বা কোনো বৌদ্ধস্তূপের অলঙ্করণ, গায়ে-গা-লাগা—সুবিমলের চোখে ভেসে উঠল।

অন্ধকার মাঠে গ্রামবাসীদের মশালের আগুন, বনকর্মীদের হেই-চিৎকার, আকাশ ছ্যাঁকা দেয়া আতশ বাজির আলো মাঝে মাঝে নেচে উঠছে আঁধার ফুঁড়ে। সুবিমল তার আশেপাশে মন্ত্রী, হাতিবিশারদ

দর্ভপাণি রায়, পুলিশ সুপার—সকলকে দেখতে পেল। সঙ্গে জিপও রয়েছে। সুবিমলের মনে পড়ল সন্ধ্যার মুখে আমরা যখন চল্লিশটি হাতির দলকে ঠেলেঠুলে দুর্গাপুর এক্সপ্রেস হাইওয়ের দিকে পাঠাতে চাইছি, তখন যূথপতি—যাকে কিনা সাধারণভাবে পালের গোদা বলা হয়ে থাকে, এমন ভাব দেখাল যেন সে সব কথা বাধ্য ছেলের মতো শুনে নেবে। অন্য তিনটি দাঁতালকে সামনে দাঁড় করিয়ে পালের গোদা প্রথমে সামনের বড় পুকুরটিতে নেমে পড়ল। তারপর তার শুঁড়ের টানে উঠে আসা জলে যে ফোয়ারা, তার প্রতিটি জলবিন্দু যেন বা আলাদা আলাদা রঙ পেয়ে যাচ্ছিল শেষ সূর্যের আলোয়। দিগন্তে সন্ধ্যার মেঘ। আকাশ সিঁদুর-লাল। যূথপতি আকাশের দিকে জল ছুঁড়ে দিতে দিতে চারপাশ ভালো করে দেখে নিতে চাইল।

এই হাতিকে নিয়েই ছোটবেলায় কত ছড়াই না জানা ছিল সুবিমলের। সে সবই তার স্মৃতিতে—

মোটা হাতি থপ থপ
ছোলা খায় গপ গপ
ছোলা গেল ফুরিয়ে
মোটা গেল শুকিয়ে।

কিংবা এ-ও তো ছিল

হাতি রে হাতি
তোর গোদা পায়ে নাথি।

সঙ্গে এটিও, ঠিক ছড়া না, কিন্তু হাতিকে ক্লাস ফাইভ সিক্সের রচনা অনুযায়ী 'কুলো কানি মুলো দাঁতি' বলা—আর তার হস্তিদর্শন, সে তো চিড়িয়াখানাতে। আলিপুরে, শীতের বিকেলে—শিকলে বাঁধা হাতিরা। তাদের গায়ে কখনও কখনও আলপনা। কিংবা সার্কাসের শিক্ষিত—খেলা দেখানো হাতি। সার্চ লাইটের আলোয় তখন এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যেত আকাশ, সার্কাসের আলোয়। আর তার ভেতর মঞ্চে খেলা দেখান হাতিরা। যারা অনেকেই সত্তরের দশকে নারকেল

ভেঙে মঞ্চে গণেশ পুজো শুরু করেছিল। সেইসব হাতির শুঁড়, শুঁড় তুলে সেলাম করা, ট্রেনারের কথা মতো হাঁটু মুড়ে বসে পড়া—সবই চোখে লেগে আছে। এমনকি তার বাল্যস্মৃতিতে তারকেশ্বরে ভোলে-বাবার নামে একটি হাতি, ছোটটি সম্ভবত মোহান্তর—হাতির থাকার জন্যে পিলখানা—সবই মনে পড়ে যেতে পারত। কিন্তু আপাতত ডিউটির সময়ে সে সব কিছুই মনে পড়ার নয়।

যুথপতি তার শুঁড়ে করে জল ছুঁড়ে দিচ্ছে আকাশে। আর তার কাছ থেকেই বোধহয় কোনো সিগন্যাল পেয়ে তিনটি দাঁতাল হাইওয়ের সমান্তরাল রাস্তা নিজেদের মতো বার করে মাঠের মধ্যে দিয়ে দে ছুট। দে ছুট। দর্ভপাণি, সুবিমল, পুলিশ সুপার আবিদ হোসেন, মন্ত্রী—সকলেই অবাক।

হই হই শব্দে ছুটে আসছিল মজা দেখতে আসা গ্রামের মানুষ, বনকর্মীরা। যুথপতি জল থেকে উঠে এল, গা ঝাড়া দিয়ে। তারপর সোজা তেড়ে গেল ভিড়ের দিকে। ভিড় থমকে গেল। তাড়াতাড়ি পিছিয়ে যাওয়ার জন্যে দৌড়ও লাগাল কেউ কেউ। নিজের গোদা পায়ের হিসেব মতো প্রায় কুড়ি পা গিয়েই পেছিয়ে এল। বাকি তিনটি দাঁতাল ততক্ষণে এগিয়ে গেছে আঁটি আমপুর ছেড়ে গোবিন্দপুরের দিকে।

এবার ছুট লাগাল গোদা। ছুট ছুট ছুট। কেন ঘোড়দৌড়ের মতো হাতিদৌড় হয় না—সুবিমল এটুকু ভেবে নিতে পেরেছিল। গোটা প্রশাসন ভ্যাবলা হয়ে পড়ল দৌড়বাজ হাতি দেখতে দেখতে।

কপালের হালকা ঘাম রুমাল দিয়ে মুছে নিল সুবিমল। চল্লিশেই কি তার প্রেসার বাড়ল! নইলে ডিসেম্বরের একেবারে শেষ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেন তার কপাল, গলা ভিজে ওঠে!

আমরা ভেবেছিলাম হুগলি পার করে ওদের বোধহয় বর্ধমানে ঢুকিয়ে দিতে পারলাম, তা আর হলো কই! নিজের গভীরে না-পারার লম্বা শ্বাসটি চেপে নিল সুবিমল।

দুর্গাপুর এক্সপ্রেস হাইওয়ের ওপরে দাঁড়িয়ে সুবিমল, আবিদ, দর্ভপাণি এতসব নজর করছিল। কাছেই দাদপুর। হাতি তাদের হাতে কেমন কাঁচকলাটি গুঁজে দিয়ে গেল ভাবতে ভাবতে তারা হাতিদের পুব মুখে চলে যাওয়া দেখতে পেল।

অন্ধকারের ভেতর এঁটেল মাটি রঙের পিঠ ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে। আমরা চেষ্টা করলাম দুর্গাপুর হাইওয়ে দিয়ে হাতির দলকে ধনেখালি ফেরত পাঠাতে—সেখানে একবার পৌঁছে দিয়ে দামোদর পার করে বাঁকুড়ার সোনামুখী জঙ্গলে ঢুকিয়ে দেয়া।

দর্ভপাণি দেখতে পেল বাঁ দিকের মাঠে মশালের বৃত্ত। তার সবে ষাট পেরন কাঁচা-পাকা মাথায় সন্ধ্যার অন্ধকার ডুবে গেল। খাকি ফুলপ্যান্ট, গামবুট, নীল জিনসের ফুলহাতা শার্ট গুঁজে পরা প্যান্টের ভেতর। তার ওপর মোটা গরম জ্যাকেট। দর্ভপাণি আবিদ হোসেন ও সুবিমলের সঙ্গে জিপে বসে। হাতিরা রাস্তায় উঠে আসছে। উত্তর দিকে হাঁটছে।

সুবিমল গাড়ি ঘুরিয়ে নিল, যাতে হেড লাইটের আলোয় চমকে গিয়ে হাতিরা না অন্য পথে চলে যায়। রাস্তা দিয়ে হাঁটা হাতিরা সামনে যেন পাইলটকার রয়েছে, এভাবে পর পর তিনটে গাড়ি। মাঝে মাঝেই থেমে দেখা যাচ্ছে হাতিদের। রাস্তার দুপাশে গ্রামবাসীরা, যেন মেলা লেগেছে। প্রচুর সাইকেল রাস্তায়। হাতি কাছাকাছি এলেই সবাই পড়ি কি মরি দৌড়। নয়তো বনবন করে সাইকেল চালিয়ে হাওয়া। পেছনে মশালের লাল আলো আকাশ চেটে নিচ্ছে। সামনে যেন সব সার বাঁধা সিনেমার হাতি। সুবিমল তাড়াতাড়ি রাস্তার পাশে তাদের তিনটে গাড়ি সরিয়ে নিল।

সুবিমল দেখতে পেল চল্লিশটি হাতির দল ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। রাস্তায় তারা থামল একটি পুলের সামনে। হাতি আর প্রশাসনের মধ্যে তফাৎ ঠিক একশো গজের—সুবিমল হিসেব করল।

হঠাৎই পুবের মাঠে নেমে পড়ল হাতিরা। মশাল নিয়ে ছুটে

আসা মানুষেরা ততক্ষণে নিজেরাই তছনছ হয়ে একটু দূরে সরে গেছে। অন্ধকারে জ্বলে উঠছে মশালের সারি। সামান্য যে ভিড় কাছাকাছি, তার মধ্যে থেকেই কেউ যেন বলে উঠল, হাতির দল গেছে পশ্চিমে।

সুবিমল কী করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। তারপর তারা পুব দিকে হাঁটতে হাঁটতে জি টি রোড ধরে শ্রীরামপুর, হুগলি, চুঁচুড়া হয়ে গঙ্গা পেরিয়ে ওপারে নৈহাটি, বারাকপুর, উত্তর চব্বিশ পরগনায়। দলমার হাতিরা ছড়িয়ে পড়ছে শহরে, তাদের আর জঙ্গলে ফেরত পাঠানো যাচ্ছে না, ভাবতে ভাবতে গায়ে জ্বর এসে যাচ্ছে সুবিমলের।

ঠিক তখনই মাঠের ভেতর রাইটার্স থেকে জেরক্স করে নিয়ে আসা ম্যাপ মেলে হাতিরা এখন ঠিক কোথায় আছে, জানতে চাইল দর্ভপাণি। সে ম্যাপও তো কতদিন আগের। দুর্গাপুর হাইওয়ে তো এই সে দিনের ব্যাপার, তার গায়ে দিল্লি রোডের চিহ্ন খুঁজে পেল না দর্ভপাণি। জেরক্সে খানিকটা ঝাপসা মতো রেখা আর অক্ষর। টর্চের আলোয় তা থেকে কত কী খুঁজে নিতে চাইছে দর্ভপাণি, সুবিমল, আবিদ হোসেন।

মাথার ওপর পৌষের তারা চমকান আকাশ। ফাঁকা মাঠে উত্তরের বাতাস তাদের গায়ে শীত বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয় আরও ভালো ম্যাপ আছে জেলা প্রশাসনের কাছে—দর্ভপাণির মাথায় এটুকু ঝলসে উঠতেই তার আবারও মনে হলো, সে সব যোগাড় করার সময় এখন কোথায়! গরম জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে তবু দর্ভপাণি ম্যাপের ওপর ঝুঁকে রইল। যেমন মন্ত্রী, সুবিমল, পুলিশ সুপার!

তারা সবাই দেখতে পেল, শীতের খানিকটা রোগা গেরুয়া গঙ্গার বুক বেয়ে ভেসে যাওয়া নানা বয়সের চল্লিশটি হাতি। ওরা সবাই গঙ্গা পেরিয়ে হুগলি থেকে উত্তর চব্বিশ পরগনা যাচ্ছে।

মন্ত্রী এলাকার জনপ্রতিনিধিও বটে, তিনি তো জনসংযোগ অনেকটাই জানেন। হঠাৎই বলে ওঠেন, কুইক। দেরি করে লাভ নেই। যে ভাবেই হোক, পুব মুখে যাওয়া হাতিদের আটকাতে হবে।

একবার গঙ্গা পেরলে আর হাতির পেছনে গিয়ে কোনো লাভ নেই—মন্ত্রীর গলায় উদ্বেগ।—ওদের রাস্তা আন্দাজ করে আগে পৌঁছে গিয়ে আটকানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

রুমালে আবারও কপালের ঘাম মুছল সুবিমল। মন্ত্রী জানালেন—দুর্গাপুর হাইওয়ের প্যারালাল একটা রাস্তা আছে কদমপুর যাওয়ার। চলুন, আমরা সেই রাস্তা দিয়ে ঢুকি।

অন্ধকারে জ্বলে উঠল তিন জোড়া হেডলাইট। তার সঙ্গে আরও তিনটি ফগ লাইট। নটি আলোয় ফসল কেটে নেয়া গ্রামের মাঠ যেন বা হেসে উঠল হঠাৎই। আকাশ দিয়ে ডানা ঝাপটে চলে যাচ্ছিল কোনো রাতপাখি।

তিনটে জিপের ইঞ্জিন ডেকে উঠল।

একেবারে ধারে বসেছিল দর্ভপাণি। হাতে গুটিয়ে রাখা পুরনো ম্যাপের জেরক্স কপি। সামনের অন্ধকার ছিঁড়ে যাচ্ছে জিপের আলোয়।

কমলপুরের রাস্তায় পৌঁছে দর্ভপাণি আবারও দেখতে পেল মশাল হাতে গ্রামের মানুষ। আলোর সঙ্গে চিৎকারও ফুটে উঠছে। এরা কি হাতি তাড়াতে চলেছে, না নিজেদের খেত বাঁচাতে কিংবা খানিকটা মজা পাবার জন্যে, দর্ভপাণি বুঝতে পারল না। আর মন্ত্রী ততক্ষণে যেন, বা এই যে দর্ভপাণি, আবিদ হোসেন, সুবিমল—সবার মধ্যে নিজেকে যূথপতি হিসেবে বানিয়ে ফেলতে পেরেছিলেন।

সোজা রাস্তা ধরে চল। জোরে। আরও জোরে। তাড়া দিচ্ছিলেন মন্ত্রী, কুইক কুইক।

দূরে, অনেকটা দূর অব্দি অন্ধকার মুছে দিতে চাইছে গাড়ির হেডলাইট। পাশাপাশি হয়ত একটু দূরেই জ্বলে ওঠা মশালের লাল আগুন, কেরোসিন পোড়া ধোঁয়া। গাঁয়ে নীল কেরোসিন এখন এতটাই পাওয়া যাচ্ছে—মন্ত্রী যেন-বা নিজেকেই নিজে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন—মনে মনেই। আলোরা প্রেতের নাচ হয়ে ফাঁকা মাঠের ভেতরেই খানিকটা দূরে দূরে।

দর্ভপাণি মনে করছিল, আমাদের মধ্যে—এই যারা হাতি তাড়াতে চলেছে, তাদের ভেতর বনদপ্তরের কোনো বিশেষজ্ঞ নেই, যারা খুব ভালো করে হাতি জানে। বাঁকুড়া থেকে হুলা পার্টি এখনও এসে পৌঁছয়নি। তারা অনেক কিছু জানে এ ব্যাপারে। দু-চার জন যা বনকর্মী রয়েছে, তারা টেনশনে, দুশ্চিন্তায়, শ্রমে, ক্লান্ত বিধ্বস্ত। তাদের অনেকেরই মুখের দিকে এখন আর ভালো করে তাকান যায় না। বর্ধমান থেকে আসা এই বনকর্মীরা হাতির ব্যাপারে প্রায় কিছুই জানে না। তাছাড়া এ-ও তো ঠিক, টানা বিশ-তিরিশ কিলোমিটার মাঠ ভেঙে হাতির পেছন পেছন। তাতে তো শরীর এলিয়ে যেতে চায়।

দূরে আবারও নেচে উঠছিল মশালের আলো। গ্রামের মানুষ হাতি খেদার কাজটাকে পর পর নিজেদের মতো ভাগ করে নিয়েছে। নিজের গ্রামটুকু পার করে ফিরে গেলেন সে গ্রামের মানুষেরা। তারপর আবার পরের গ্রামের লোকজন।

কদমপুর পৌঁছে তখনই কী করা উচিত মন্ত্রী ভাবতে পারছিলেন না। সুবিমল তার গালের একদিনের বাসি দাড়িতে আঙুল ছোঁয়াল। আজ দাড়িই কামান হয়নি—সুবিমল আরও একবার তার দু-গালে পাঁচ আঙুল কচলে নিল।

আমাদের সঙ্গে কিন্তু জোরালো সার্চ লাইট নেই, যা দিয়ে অন্ধকারে হাতিদের মুখ ঘুরিয়ে দেয়া যায়—নিজের ভেতরে এসব বলতে বলতে সুবিমল বাইরের অন্ধকারে তাকাল। তখনও মানুষ আসছে তো আসছেই। তাদের গলায় মাঠ কাঁপান চিৎকার। হাতে অন্ধকার তাড়ান মশাল।

মন্ত্রীর কাছে এ এলাকার পথঘাট অনেকটাই জানা। তিনি অভিজ্ঞতা থেকে বলে উঠলেন, হাতিরা পুবদিকে যাচ্ছে। ওদের আটকাতে হলে দিল্লি রোড যেতে হবে। টেনশনে হয়তো বা মন্ত্রীরও গলা কেঁপে যাচ্ছিল।

আমাদের সার্চলাইট চাই, অন্ধকারে দর্ভপাণি রায়ের কথা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে বাতাসে মিশে গেল।

মন্ত্রী আবারও বললেন, চল দিল্লি রোড। সুগন্ধার মোড়ের দক্ষিণে

কিছু একটা করতে হবে। তা শুনে দর্ভপাণির মনে হলো এবার হয়ত বা ব্যূহ সাজান হবে।

মন্ত্রী তাঁর হিসেব মতো বলতে চাইলেন, হাতিরা যাবে এখান দিয়েই। দিল্লি রোডের ওপর লাইন দিয়ে লরি দাঁড় করিয়ে, হেডলাইট জ্বেলে, হর্ন দিতে দিতে আমরা দলটাকে আটকাব।

রাত তখন প্রায় এগারোটা, ঘড়িতে সময় দেখল সুবিমল।

দিল্লি রোডের ওপর সার দিয়ে দাঁড় করান হলো লরি। দূর থেকে মাঠে অন্ধকারের ভেতর আগুন দেখান মশাল-বাহিনী এগিয়ে আসছে। তার সামনে হাতিরা।

সমস্ত আলো জ্বেলে দাও—সুবিমল বলে উঠল।

লরির হেডলাইটেরা জ্বলে উঠে আলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল মাঠের ওপর।

সেই সব বর্ষার মেঘ রঙের পাহাড়েরা, যারা ধীরে চলছিল, তারা আরও কাছে।

হর্ন বাজাও—সবাই একসঙ্গে—এবারও সুবিমলের গলা।

লরির হর্ন বাজছে। তিনটি সরকারি জিপের হর্ন বাজছে। সঙ্গে পুলিশের গাড়ির সাইরেন।

পাহাড় সরল। মুখ ঘুরল হাতির দলের। রাস্তা না পেরিয়ে আলোয়, হর্নে থতমত খেয়ে তারা ঢুকে পড়ল একটু দূরের ঘন বাঁশবনে। পাশেই বিশাল কলা বাগান। সে সব গাছও এই শীতের রাতে অন্ধকার মেখে চুপচাপই দাঁড়িয়েছিল।

দূরে গাঢ় অন্ধকার। বাঁশবনের ভেতর মিশে গেছে চল্লিশটি হাতি।

মন্ত্রী উদ্বেগে ছিলেন।

সবুজ বাঁশবন চুপচাপ পড়ে আছে। কেবল তার শুকনো পাতায় ভারি পায়ের শব্দ বেজে উঠছিল। আর আকাশ থেকে নেমে আসা চাঁদের আলোয় তৈরি হয়েছিল কী এক কুহক।

লেখাটি এ পর্যন্ত একটা জায়গায় এসে গেছে। হাতিরা বিহারের দলমা থেকে নেমে শহরে আসতে চাইছিল। অন্তত এমনই তো ভেবে

নিয়েছে প্রশাসন, খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিশন। দূরের শীত, রাত, অন্ধকার পেরিয়ে হাতিরা আসছিলই।

পুলিশের সাইরেন, লরির হর্ন—সবই ঘন ঘন বেজে যাচ্ছিল। বাঁশবনে হাতিরা হারিয়ে গেলে দর্ভপাণি আকাশের নীলিমায় ফুটে থাকা তারা দেখছিল। চারপাশে মশালের আলো, ফিস ফিস। ভিড় করা অনেক মানুষ। কেউ কেউ বলছিলেন, ইস্, একটা হাতির বাচ্চা ধরা গেল না। কোনো রকমে একটা যদি—

মন্ত্রী তো এখানকার জনপ্রতিনিধিও বটে। তাঁকে কেউ কেউ লোকাল আলাপের সূত্রে বিষয়টি জানাতে চাইছিল—হাতির একটা বাচ্চা যদি পাওয়া যেত। তাদের এসব টুকরো কথাবার্তা, ভিড় করে দাঁড়ান যাওয়া-আসা—এ সবের মধ্যেই রাত বেড়ে যাচ্ছিল।

দলমা থেকে আসা হাতি দেখতে, হাতি তাড়িয়ে নিয়ে যেতে এই যে ভিড় তার মধ্যে আমরা সাবুকে পেয়ে যাই। আসলে সাবুর নাম কে যে সাবু দিয়েছিল, আজ আর তেমন করে কারুর মনে নেই। গ্রামের মানুষের সঙ্গে হই হই করতে করতে সাবুও এক সময় এই মশালের ভিড়ে ঢুকে পড়েছিল। সাবুর বয়স উপন্যাসের খাতিরে চোদ্দ পনের, কিংবা কখনও আর একটু বেশি হয়ে যায়, তাহলেও ভাবার কিছু নেই।

সাবু নামের ভেতরেই একটি মহিমা আছে। তা হলো এরকম। এক সময় বোম্বাইয়ের কিছু জঙ্গল-সিনেমায়, সিনেমা না বলে 'পিকচার' বলাই বোধহয় ভালো, সাবু নামের একজন হিরো, যে কিনা প্রায়শই হাতির পিঠে—সেও তো হয়ত চল্লিশ বা পঞ্চাশের দশকেই হবে, তখন হলিউডে টারজানের খুব রমরমা, আর কলকাতার দেবসাহিত্য কুটিরের ছোটদের মাসিক 'শুকতারা'য় টারজান-নোরা সিরিজ তারও অনেক পরে, যার লেখক সব্যসাচী।

সাবুর বাবা-মা এসবের কিছুই জানে না হয়ত, কিংবা জানে। আর সাবু দূরে—বাঁশবাগানের ভেতর মুছে যাওয়া হাতিদের দিকে তাকিয়েছিল, তার হাতে মশাল।

সাবুর ওপর কোনো আলো ছিল না। কিন্তু আকাশের চাঁদ তাকে খানিকটা জ্যোৎস্না দিয়েছিল।

সাবুর গায়ে চাঁদের আলো লেপ্টে গেলে কেমন যেন অন্য রকম লাগে। আলো পাঠাতে পাঠাতে চাঁদের মনে পড়ে আলেকজান্দার কার্দার আবিষ্কার করা 'রিয়েল লাইফ এলিফ্যান্ট বয়' সাবুর কথা। এ সাবু কি সেই সাবু? যার অভিনয় করা ছবি পর পর হিট! 'এলিফ্যান্ট বয়', 'জাঙ্গল বয়', 'থিফ অফ বাগদাদ'!

সাবুকে এসব জিজ্ঞেস করলে কোনো উত্তর পাওয়া যায় না। সে চুপ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

দর্পপাণি, মন্ত্রী, এস পি, ডি এম—কে যে কাকে স্যর বলেন এখন—

ডি এম কে—এস পি—স্যর, হাতি।

এস পি-র 'স্যর' মন্ত্রীকে চালান করে দেয় ডি এম। আবার ডি এম-এর সেই 'স্যর' মন্ত্রী খানিকক্ষণ নিজের কাছে রেখে অবলীলায় বাড়িয়ে দিতে পারেন হাতিবিশারদ দর্পপাণি রায়ের দিকে। মাঠ জুড়ে মশালের আলো, হেডলাইটের রোশনাই 'স্যর' নামের শব্দটি একই সঙ্গে নেচে ফেরে।

সাবু এইসব 'স্যর' ইত্যাদির বাইরে দাঁড়িয়ে বাঁশবাগানের দিকে তাকিয়ে। শুকনো পাতার ওপর গোদা পায়ের শব্দ তখনও ফুটে উঠছে। সাবু চুপ করে সেই শব্দ শোনার চেষ্টা করছিল।

রাত বাড়ছে নিজের নিয়মে। শীতের বড়, গভীর রাত। তবু লোকজন তো ছিলই। দর্পপাণি, মন্ত্রী, সুবিমল, আবিদ হোসেন চারপাশের লোকজনকে মাঝে মাঝেই ধন্য করে দিয়ে হাতিরা সত্যি সত্যি বাঁশবাগানে কিনা, এমনটি জেনে নিতে গিয়ে এমুখ ওমুখ থেকে ঠিকঠাক খবরটি পেতে রাত প্রায় দুটো।

দর্পপাণি হাতের ঘড়িতে সময় দেখল। সুবিমল দেখল। আবিদ হোসেন, মন্ত্রীও। তিনজনে নিজের নিজের ঘড়ি মিলিয়ে নিলেন।

চলুন, বাঁশবাগানের ভেতরে ঢুকে পড়ি। দর্পপাণির প্রস্তাব।

আমাদের যদি চার্জ করে

আমাদের যদি অন্ধকারে পিষে দেয়

আমরা যদি বিপদে পড়ি

বাইরের পাবলিক এখন একটু যেন চুপচাপ।

সাবু তাদের সঙ্গেই মিশে চুপকরে দাঁড়িয়ে। আমি কি এলিফ্যান্ট বয়! জাঙ্গল বয় কি! এসব কথা কি তার মনে ঢেউ তুলছিল? সে কথা হয়ত চাঁদ জানে। আবার না-ও জানতে পারে।

দর্ভপাণি আর একটু দাঁড়াল। আবারও তাকাল আকাশের দিকে। আস্ত একখানা চাঁদ ভেসে থাকা পরিষ্কার কালচে নীল আকাশের গায়ে অজস্র তারার বুটি। ঠ্যাঙ মেলে শুয়ে থাকা কালপুরুষ। তার হাতে শিকারের তীর-ধনুক। শিকারী কুকুর। সবই তারায় বোনা।

দর্ভপাণি কী ভেবে তখন একবার শ্বাস চাপল। তারপর বনবিভাগের কর্তাদের জিপে উঠে বলল, বাঁশবনের উত্তরে গ্রাম। এখনকার লোকজনদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি। বাঁশবন আর কলাবাগানের যারা মালিক, তারাও কেউ কেউ আছে। চকোলেট বোমা ছুঁড়ে, হাউই উড়িয়ে, যেভাবে হোক হাতি তাড়াতে হবে। পশ্চিমদিক থেকে কোনো রকম শব্দ বা তাড়াহুড়োতে ভড়কে গিয়ে হাতিরা যদি দূরে চলে যায়, কে জানে হয়ত তখন সার বাঁধা লরি, তার হেডলাইটের আলো হর্ন কিছুই শুনবে না হাতিরা। তারা পুব দিকে হাঁটতে থাকবে, সব তছনছ করে—সে ভাবা যায় না। আবার সাবধান থাকতে হবে দক্ষিণ থেকে আমাদের ফাটান পটকার শব্দে, আগুনে হাতি না গ্রামে ঢুকে যায়—এটুকু অবশ্য মনে মনেই রাখল দর্ভপাণি।

মধ্য শীতের উড়ুক্কু হাওয়া তার গালের চামড়ায় টান ধরাচ্ছে। ফর্সা লালচে গাল, তেমন মাংস নেই। হনু জেগে উঠেছে। এখন উত্তরে বাতাসে হিম। তাতে গাল চড় চড় করে। দর্ভপাণি ভাবছিল এ সময় একটু বোরোলীন বা ওরকম কিছু, ঠোঁটে-গালে ঘষে নিতে পারলে হয়ত আরাম পাওয়া যেত।

দর্ভপাণিদের জিপ থেকে ওয়াকিটকি খবর দিচ্ছে পুলিশ সুপারকে।—ওভার—আমরা চার্জ করতে যাচ্ছি—ওভার। আমরা চার্জ করতে যাচ্ছি, ওভার—রাস্তার দিকে নজর রাখুন। ওভার—

শীত রাতের বাতাস ওয়াকিটকির যান্ত্রিক, খসখসে শব্দে খানিকটা খানিকটা ছিঁড়ে গেল।

চারপাশে ফুটফুটে চাঁদের কণা। সে সব কুড়িয়ে নিয়ে ধরে রাখলে কত যে স্বপ্ন তৈরি হতে পারত। কিন্তু এখন জিপের চাকার নিচে, তার গর্জনে সেই জ্যোৎস্নার জলছাপ থেঁতো হয়ে যেতে চাইছিল।

দর্ভপাণি সেই আশ্চর্য জ্যোৎস্নায় চারপাশ কেমন যেন অন্য চোখে আবিষ্কার করল: হাওয়া আবারও তার গাল ছুঁয়ে গেলে 'বঙ্গ জীবনের অঙ্গকে' মনে পড়ল দর্ভপাণির।

জ্যোৎস্নায় ততক্ষণে এক অলৌকিক বিভ্রম তৈরি হয়েছে বাঁশ বাগানে, অজস্র কলাগাছের পাতায় পাতায়। আলো-ছায়া জ্যোৎস্নায় মাখামাখি সবুজে কোনটা হাতি আর কোনটা যে হাতি নয়, বুঝতে খানিকটা সময় লাগে দর্ভভপাণির। জল মেশান দুধ রঙের আলোয় মাটিমাখা, মাটি রঙের হাতিরা কোথায়—তারা কি সব মায়ামন্ত্রে অদৃশ্য হয়ে গেল মেঘপাতালে—আকাশের গায়ে!

সুবিমল আবারও 'মেঘপাতাল' শব্দটিকে মনে করতে পারল। কোনটা হাতি, কোনটা তার ছায়া, নাকি এসবই বাঁশগাছের অলীকে দাঁড়িয়ে থাকা, কলাগাছের শুকনো পাতা অথবা তাদের স্বাস্থ্যবান কাণ্ডের ছায়াবাজি?

কয়েকজন উৎসাহী সামনে এগিয়েছিল। সুবিমল আর আবিদও ছিল তাদের সঙ্গে। তারা খানিকটা পরে ক্লান্ত মুখে গায়ে শরীরে শেষ হয়ে আসা জ্যোৎস্নার সর মেখে বলল, সব হাতি বাঁশবাগানে। বাঁশ বনের ভেতর না গেলে কিছু বোঝা যাবে না।

পাশ থেকে কে যেন জানতে চাইল—কোনো উপায় নেই এ সাইড থেকে কিছু করার!

মন্ত্রীও এসে গেছেন এর মধ্যে। তারপর চাঁদের আলো মাথায়

নিয়ে শীতের রাতের সেই অভিযান। বাতাসে বাঁশের পাতা কেঁপে কেঁপে উঠছে। আর পায়ের শব্দে, শরীরের নড়াচড়ায় বাঁশবনের ভেতর থেকে কোনো পাখি ডানা ঝাপটে আরও দূরে খানিকটা আকাশ পেরিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে চাইল। কঞ্চির খোঁচা, বাঁশের ডগার আঘাত বাঁচিয়ে ধীরে ধীরে এগনো। সুবিমল, দর্ভপাণি, আবিদ হোসেন, মন্ত্রী।

চাঁদের ধূ ধূ আলোয় বাঁশবাগানের ভেতর যেন বা স্বপ্নজগৎ। দর্ভপাণি দেখতে পেল। সেই জগতের আশ্চর্য মসলিন সরিয়ে দিতে পারলে হয়তো বা তার ওপারে আর কোনো নতুন চমক। হয়তো সেখানে হাতি নেই। ম্যামথ আছে। খ্রিস্ট জন্মের দুশো পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে থেকে শুরু করে দশ হাজার বছর আগেও আফ্রিকা ছাড়িয়ে হাতিরা ছড়িয়ে পড়েছিল সমস্ত পৃথিবীতে। তারপর এই তো সেদিন, ১৯১৬-১৭ সালে সিংভূম আর ধলভূমের হাতি হাঁটতে শুরু করল রায়গড়ের দিকে, বিহারের গুমলা হয়ে। এদিকে রাঁচি, হাজারিবাগ, কোডারমা, তারপর সুবর্ণরেখা পেরিয়ে, কংসাবতী পার হয়ে মেদিনীপুরের গড়বেতায়। বাঁকুড়ায়। ভাবতে ভাবতেই এতক্ষণ পর কেন জানি না দর্ভপাণির সিগারেটের কথা মনে হলো, কিন্তু এই সময় আগুন বা অন্য গন্ধ—হাতি তেড়ে আসতে পারে, এমনটি মনে পড়তেই দর্ভপাণি ভাবনা থেকে দূরে সরাল সিগারেটকে। আর তখনই তার পা ফসকাল খানার ভেতর।

বাগানের ভেতর মাটি কেটে তৈরি খানা আছে, এমনটি জানা ছিল ঢোকার আগেই। তবু মনের ওপর এরকম চাপ তৈরি হলে সব মনে রাখা যায় পর পর? দর্ভপাণি খানার ভেতর পড়ে যেতে যেতে শুনতে পেল—বাবু সামলে। বাবু সামলে। বাবু পড়ে গেল।

হয়তো বা এই সব কথার সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা চাপা হাসিও মিশে ছিল, গ্রামেরই কেউ কেউ, যাদের বাঁশবন তারাই হবে হয়তো, কিংবা এই বাঁশঝাড়ের ভেতর সারি দেয়া পেঁপেগাছের মালিক, যারা অনেকেই নিজেদের বড়, পেকে আসা পেঁপের গায়ে নাম লিখে রেখেছে—এমনটা

বোধহয় চুরি গেলে চোর ধরার জন্যে, তারাও কেউ দর্ভপাণির পড়ে যাওয়ায় হেসে উঠতে পারে। আসলে পথ তো তারাই দেখিয়েছিল।

পড়ে গিয়ে উঠে পড়তে একটু সময় লাগল দর্ভপাণির। শুকনো মাটি ডান হাঁটুতে ব্যথা দিয়েছে।

দর্ভপাণি সামান্য ল্যাংচাচ্ছিল। মুখে যন্ত্রণা হচ্ছে, এমনটি জানানর উপায় নেই। বয়স্ক মানুষ পড়ে গেলে সকলে এমনিই মজা পায়, তারপর যদি সে আবার ব্যথার কথা বলে—এমনটি ভেবে দর্ভপাণি ভেতর থেকে উঠে আসা কষ্ট নিজের ভেতরেই আটকে ফেলল।

উঠে পড়তে গিয়ে জমিতে ভর দিতে হলো। আর হাতের ভরে নিজেকে ঠেলে তুলতে গিয়ে দর্ভপাণি তার হাওয়ায় ভাসা আর একটি হাতের ভেতর একটি নবীন, অথচ জোরাল টানের স্পর্শ পেল।

সাবু দাঁড়িয়েছিল কাছাকাছি। ঠিক দাঁড়িয়ে ছিল না, চলছিল। আর এ অঞ্চল তার অনেকটাই চেনা। এমনকি এই ফিকে কুয়াশামাখা চাঁদের আলোয়, হিমে বাঁশবনে তারা সবাই যখন চল্লিশটি হাতিকে পশ্চিমে, শুধু পশ্চিমদিকে ঠেলে নিয়ে যেতে চলেছে, তখন দর্ভপাণির এই ছিটকে যাওয়া, তা কি করে হয়! তাই সাবুকে কাছে থাকতেই হয়।

প্যান্টের ভেতর হাঁটুতে জ্বালা করছে। বোধহয় ছড়েছে। সে যা হোক পরে দেখা যাবে। এখন আর দাঁড়াবার সময় নেই।

বাঁশবনের ভেতর প্রায় সবখানেই চাঁদের আলোছবি। তার ফাঁকে ফাঁকে বাঁশের ছায়া। টর্চ জ্বালান যাবে না। আলো দেখে যদি দাঁতালরা তেড়ে আসে। কিংবা দাঁতাল ছাড়া অন্যরাও।

বাবু, লাগে নি তো—কে যেন বলল দর্ভপাণিকে।

দর্ভপাণি মাথা নাড়ল। আবছা আলো-ছায়ায় সে তেমন করে সাবুকে দেখতে পেল না।

আর তখনই সুবিমল চিৎকার করে উঠল—হাতি, ঐ যে হাতি।

ঠিক কুড়ি গজ দূরে—কি একটু বেশিও হতে পারে—আবিদ হোসেন দেখল। মন্ত্রী দেখলেন। দর্ভপাণি আর সঙ্গের গ্রামবাসীরাও।

আর সুবিমল! সে তো একটু আগেই দেখেছে! জ্যোৎস্না লাগা মেঘপাতালের ঐরাবত যেন। তারা পর পর গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে।

আলাদা আলাদা খবরের কাগজের জন্য চারেক রিপোর্টার, তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে একজন করে ফোটোগ্রাফার—তারা সবাই দেখতে পেল জ্যোৎস্নায় যেন বা পাহাড়খণ্ড দাঁড়িয়ে। তাদের কাদা রঙের চামড়ায় চাঁদের আলো পড়ে গড়িয়ে যাচ্ছে।

কেউ কোনো কথা বলতে পারছে না। শব্দে যদি হাতিরা ফেরে। দেশলাই, টর্চ—সব কিছুই জ্বালান বারণের মধ্যে পড়ে।

তারপর কে যেন বলল, চার্জ। আর তা বললেও হয়ত চকোলেট বোমা ফাটত। হাউই আগুন ছড়াত আকাশে। হাতিরা আবারও নড়তে শুরু করল দল বেঁধে। শুকনো কলাঝোপে, দাঁড়িয়ে থাকা কলাগাছ, বাঁশের সতেজ শরীর তাদের পায়ের নীচে শুয়ে পড়ল। আর তখনও আলোয়-ছায়ায়, জ্যোৎস্নায়-অন্ধকারে, বুঝি অনেক হাতি চারপাশে। চল্লিশটি নয় শুধু, তার চেয়ে আরও অনেক অনেক বেশি যেন, যারা সবাই এই কলাবাগান, বাঁশবনের দখল নিতে আসছে।

শেষ রাতের বাতাসে শীত যেন আরও একটু জাঁকিয়ে নেমেছে। ফাঁকা মাঠে হিম টের পাওয়া যায় বেশি। ঘড়ি দেখল সুবিমল। রাত সাড়ে তিনটে। পটকার শব্দে, হাউয়ের আলোয় হাতিরা ততক্ষণে নেমে গেছে দক্ষিণে।

দর্ভপাণির মনে পড়ল দিল্লি রোডে এখন লরির সারি। তাই হাতিরা রাস্তা পেল না। হুগলি শহরের পশ্চিমে চলে গেল তারা।

সুবিমল মনে মনে রোড ম্যাপের সব কিছু ঝালিয়ে নিচ্ছিল। আর মন্ত্রী হয়তো বা সুবিমলকেই বলছিলেন, এখনই চুঁচড়োর পুলিশ কনট্রোল রুমে বসে বাঁকুড়ার এস পি-কে ধরতে হবে। ধরেই ওকে বলা দরকার, ওখানকার ডি এফ ও-কে অর্ডার দিয়ে হুলা পার্টি আনান। হুলা পার্টি না হলে হাতি তাড়ান অসম্ভব।

আসলে এতো দর্ভপাণি জানে। শুধু রাতে লাল আগুন জ্বালা মশাল হাতে হাতিকে তাড়া করা নয়, দিনের বেলাও মশাল নিয়ে,

আগুন আর ধোঁয়া সমেত চিৎকার করতে করতে ওদের পেছনে যাবে হুলা পার্টি।

ক্লান্তিতে হাই উঠল সুবিমলের। সে আরও একবার প্যান্টের বাঁ পকেট থেকে রুমাল বের করে অভ্যাসে কপালের গায়ে জেগে না ওঠা ঘাম মুছল। তারপর পাট করা রুমাল পকেটে গুছিয়ে রেখে ছোট একটা হাই তুলে ভেবে নিতে চাইল কী কী করা দরকার। হাতি খেদানোর জন্যে চাই আরও সার্চ লাইট, হাউই, পটকা। সাহসী লোকজন আর যে জেলার ডি এফ ও-দের এমন কাজের অভ্যেস আছে নিয়মিত, তাদের সাজেশান দরকার।

মন্ত্রী ভাবছিলেন উত্তরবঙ্গ থেকে কুনকি হাতি আনানোর কথা। ট্রাকে চড়ে অন্তত তিনটি আসবে, এমনটি জানা আছে।

ট্রাকে করে অন্তত তিনটি কুনকি হাতি। কথাটা তিনি দর্ভপাণিকে বলতেই ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন দর্ভপাণি।

বেশ, উত্তরবঙ্গের কুনকিরা নয় ট্রাকে চেপে এলো হুগলিতে, তারপর? দর্ভপাণি, মন্ত্রী যেন বা আকাশে জিজ্ঞাসা ছুঁড়ছিলেন।

বাঁকুড়ায় এ-ব্যাপারে কিছু এক্সপার্ট আদিবাসী আছে। তাদের তলব দেয়া দরকার। বলতে বলতে দর্ভপাণি আবারও সিগারেটের টান অনুভব করছিল।

কাল রাইটার্সে বিষয়টি উঠবে—সি এম কে ব্রিফ করতে হবে। মন্ত্রী মনে মনে হিসেব করছিলেন। হাতিরা যদি সত্যিই কলকাতায় ঢুকে যায়! হুগলি নদী পেরিয়ে নৈহাটি—তারপর? ভেবেই গায়ে কাঁটা দিল মন্ত্রীর। হয়ত বা শীত-বাতাসেই, নাকি দুর্ভাবনায়—নিজেই স্পষ্ট না বুঝে একটা ছোট হাই তুলে ফেললেন।

রাত তার নিজের হিসেবে ফুরিয়ে আসছিল। আবিদ হোসেন কি ভেবে যেন তার প্যান্টের দু-পকেটে হাত ঢুকিয়ে ফেলল।

২। একটি সাক্ষাৎকার, কাল্পনিক?

সাবু এই বনস্থলী, কলাবাগানের ছায়া, বাঁশের ঝরাপাতা, পেরিয়ে কখন যেন হাতির দলের কাছাকাছি চলে এসেছে। শেষ রাতের মার্বেল রঙ জ্যোৎস্নায় গজেন্দ্রগমনে চলা চল্লিশটি প্রাণী। তার কাছাকাছি সাবু।

সাবু আসলে দল নেতার সাক্ষাৎকার চাইছিল। সাবু কী হাতির ভাষা জানত? কিংবা সে কী পালকাপ্য ঋষির কথা জানতে পেরেছিল অগ্নিপুরাণের ২৮৭তম অধ্যায় থেকে? যে পালকাপ্য ঋষির জন্ম হয়েছিল হস্তিনীর গর্ভে। তাঁর কথা লিখে গেছে চাঁদ কবি 'বীর গাথা'য়।

পালকাপ্য নাকি থাকতেন অঙ্গদেশে লুহিতাক্ষ সরোবরের কাছে। সাবু হয়তো বা চাঁদ কবির বীরগাথা ও পালকাপ্য ঋষিকে খানিকটা খানিকটা জানে। অহোমরাজ শিব সিংহের বড় রানী অম্বিকা দেবীর কথায় সুকুমার বড়কায়েত যে 'হস্তি বিত্থার্ণব' লিখেছিলেন তা কী জানা আছে সাবুর? কিংবা সে কিছুই জানে না। হয়তো সে সম্পূর্ণ এক অলীক বিভ্রমে আসলে যূথপতির সামনে যেতে চেয়েছিল।

সাবু যদি জেনে থাকত বাংলার জঙ্গল মানে এখন শুধু উত্তরবঙ্গের জঙ্গল, তাহলে তার সুবিধে হতো। দক্ষিণবঙ্গের মেদিনীপুর ছাড়াও বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার জঙ্গল মুছতে মুছতে ছোট হয়ে আসছে। আর সেই সংকীর্ণ পথে হাতিরা যাওয়া-আসা করতে প্রায়ই অসুবিধেয় পড়ে।

সাবুর সুবিধের জন্যে আমরা এখানে কিছু তথ্য সাজিয়ে দি, তা থেকে তুলে নিয়ে যদি সাবু প্রশ্ন হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেয় যূথপতির সামনে, সে তো এক কাণ্ডই হবে। এখন মানুষের সঙ্গে প্রায়ই সামনা-সামনি দেখা হয় জঙ্গলের হাতির। এই ক্রমাগত দেখাশোনার ফলে এক জেনারেশন পরেই পুরুষ হাতি ন ফুট দশ ইঞ্চির জায়গায় পৌনে ন ফুট অব্দি বাড়ছে। সে জায়গায় মেয়ে হাতি আট ফুট।

আগে আগে গজ দাঁত হতো ছ ফুট লম্বা এখন ওজনে পঞ্চাশ কেজি গজ দাঁত, লম্বায় তিন ফুট। আগে তিনটি হস্তিনীর জন্যে

একটি হস্তি। আর এখন একটি হাতির জন্য তিন থেকে কমে দেড় খানা হাতি-বৌ।

সাবু নিজেই দেখেছে দশ বছর আগে বুনো হাতিরা ছিল বেশ লাজুক। এখন আর ওরা মানুষকে তেমন ভয় পায় না। আগুন দেখলে না-পালিয়ে তেড়ে আসে। পটকা ফাটলে চোখ পিট-পিট করে।

ভুট্যান থেকে কাজ খুঁজতে মানুষ আসে। হাতি বোধহয় আর নেমে আসে না। অসমের দল বাঁধা হাতিরা আর তোর্সা নদী পেরোয় না।

কুড়ি বছর আগেও একটি দলে থাকত তিরিশ থেকে পঞ্চাশটি হাতি। তাতে ছোট মেয়ে বড় মেয়ে হাতি মিলিয়ে দলের ফিফটি পার্সেন্ট। সঙ্গে একটি কখনও বা দুটি ব্রিডিং টাস্কার। বয়স্ক দাঁতাল পুরুষ যাকে বলে। আর আট থেকে দশটি 'সারিন'—তারা সবাই নবযৌবনা কুমারী হস্তিনী।

উত্তরবঙ্গে নাকি হাতি এখন একশো ছিয়াশিটি—এ-গোনার হিসেব ১৯২২-এর। তারমধ্যে এমনও একটি দল দেখা গেছে, যেখানে একটি পুরুষ, একটি স্ত্রী হাতি—তাদের একটি বাচ্চা। এ যেন ফ্ল্যাট বাড়ির বাসিন্দাদের বাসা। মিয়া-বিবি আর তাদের বাচ্চাটি।

সাবু চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে নিজের মনে মনেই বিড় বিড় করতে করতে বলছিল, হাতি খেতে ভালোবাসে পটকা শিরিষ। দিনে খাবার খায় চারশো থেকে সাড়ে চারশো কেজি। আবার কেউ কেউ বলেন, দু কুইন্টাল।

হাতি আরও পছন্দ করে দীননাথ ঘাস, মালবেরি, ডোকা, গলগলি, শিশুগাছের কাণ্ড, কলাগাছ, মহুয়া ফল, কয়েতবেল, বাঁশপাতা জাতীয় খাবার। হাঁড়িয়া, এমনকি মদও। হুগলিতে ঢুকে পড়া দলমার হাতি কিন্তু বাঁশপাতা, কলা তো খেয়েইছে। তার সঙ্গে আলু, গমও। মদের দোকানে, চোলাই মদের ঠেকে তারা মাঝে মাঝেই ঢুকে পড়ে।

কে বলল একথা? আকাশের মেঘ কি? সাবু বুঝতে পারল না।

ভুট্টা আর ধানের লোভে জঙ্গল থেকে নেমে আসে হাতি। এমনও দেখা যায় অনেক সময়ই পটকা-আগুন নিয়ে হাতি তাড়াতে আসা মানুষরা দেখছে শুঁড়ে শুঁড়েই কি এক তাড়াহুড়োয় ভুট্টা নয়তো ধান মুখে পুরছে হাতি।

সে ছবি যারা দেখেছে, তারা দেখেছে। সাবু দেখেনি। সাবু এ-ও জানে না হাতি এক রাতে অনায়াসে চল্লিশ কিলোমিটার হেঁটে যেতে পারে। আবার ইচ্ছে করলে এক ঘণ্টায় চল্লিশ কিলোমিটার যাওয়া তাদের কাছে কোনো ব্যাপারই নয়।

সাবু তার হাতের মশাল নিভিয়ে ফেলে দিল দূরে। চাঁদের এই প্রায় নিভে আসা আলোয় একরকম নিঃশব্দেই, যতটা পা টিপে টিপে যাওয়া যেতে পারে, সেরকম ভাবেই সাবু হাতির পালের গোদাটিকে ধরতে চাইছিল।

এই মরে আসা চাঁদের আলোয় নিজের ছায়া দেখলেও কেমন যেন গা ছম ছম করে ওঠে। রুক্ষ মাঠ—জ্যোৎস্নার ভেতর একজন কমবয়েসি মানুষের ছায়া। সাবু অবশ্য সেদিকে তাকাচ্ছিল না। তার মা তাকে কবেই যেন বলে দিয়েছিল, অন্ধকারে, কিংবা একা একা নিজের ছায়া যে দেখে সে অনেক সময় ভয় পায়। আর এই হঠাৎ ভয় পাওয়া একেবারেই ভালো নয়।

সাবুর এই হাঁটার ফাঁকে ফাঁকে সাবুকে আমরা আরও কিছু জানিয়ে দিই হাতিদের ব্যাপারে।

ও সাবু, শুনছ! হাতিরা সারাদিনে জল খায় আশি থেকে একশো লিটার। জল খাওয়ার সময় সেই ভোরবেলা, সূর্য ওঠার পরেই। আর বিকেলে সূর্য ডোবার আগে। চলতে চলতে চান সেরে নেয়া, সূর্য ডুবে গেলে। শীতে এ-নিয়ম বদলে যায় না, কিন্তু গরমে—তখন তো গা গরম, মাথা গরম।

সাবু অবশ্য এখন গরম ভাবতে পারছিল না। ২৯ ডিসেম্বরের

শেষ রাতের শীত তার হাড়ের ভেতরে বিঁধে যাচ্ছিল। আর তখনই তাকে আমরা মনে করিয়ে দিলাম, একদিনে বারো থেকে ষোলোবার হাত্তির নাদ বেরিয়ে আসে শরীর থেকে।

সাবু এতসব কথা কি শুনতে পেল! আর এই সময়ে যখন ইনফরমেশন ও ডাটাই সমস্ত কিছুর সারাৎসার, তখন সাবু যেন-বা এক মৌন সন্ন্যাসী, তাকে তো হেঁটেই যেতে হবে দাঁতালের কাছে একা, একা—এমন ভাবনার ভেতর হাঁটতে হাঁটতে সাবু খানিকটা দূরে সেই গায়ে গা লাগান টালমাটাল পাহাড়দের দেখতে পেল।

আকাশ থেকে নেমে আসা আলোয় সাবু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল তাদের প্রত্যেকের শুঁড় প্রত্যেকের গায়ে লাগান। এভাবে তারা নাকি টেলিফোন করে নিজেদের ভেতর। এশিয়াটিক হাতিরা নিজেদের মধ্যে সংকেত বিনিময়, ইনফ্রাসোনিক কমিউনেশন—এমনটিই বলে থাকে সাহেবরা, করতে পারে প্রায় দশ কিলোমিটার পর্যন্ত। আর আফ্রিকার হাতিরা কুড়ি থেকে পঁচিশ কিলোমিটার অব্দি।

উত্তরবঙ্গে হাতিরা নড়তে শুরু করবে মে মাস থেকে—ও সাবু, শুনে নাও।

সাবু গো, শোনো। ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিলে বৃষ্টি নেই। মানে মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ—উত্তরবঙ্গের হাতি নড়ে না বাইরের দিকে। ঘুর ঘুর করে তরাইয়ের ছায়া ছায়া, ভিজে ভিজে জঙ্গলে। সেখানে তখন অনেক খাবার। জল। থাকা, বেড়ান, ঘুমোনোর জায়গা। তারপর বৈশাখ পার করে জ্যৈষ্ঠ পেরিয়ে আষাঢ়—এরকম করতে করতে আশ্বিন। ইংরেজির অক্টোবরে, যখন ধান উঠবে। আহা, সোনা রঙ ধানের গন্ধ কী। খেয়েও আনন্দ।

কিন্তু সাবু এ-সবই তো উত্তরবঙ্গের হাতি। দলমার হাতি, যা কি না এখন তোমার সামনে হুগলির রাস্তায়—সাবুকে আমরা মনে করিয়ে দিতে চাইলাম। কিন্তু সাবু তো আসলে কোনো কথাই শুনতে চাইছে না। তার গায়ে সুতির একটা ফুলহাতা মোটা গেঞ্জি, বুকের ওপর ইংরেজি অক্ষরে লেখা 'র‍্যামবো'। হাফ প্যান্ট। খালি পা।

অন্ধকারে সে হেসে উঠলে তার দাঁত গজদন্তের থেকেও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এমন কি এখন হাতিরা দাঁড়িয়ে গেলেও সাবু তেমন জোরে আর এগোয় না। সে তো কিছুতেই হলিউডের 'টারজান, দ্য এপ ম্যান' বা বলিউডের—ইদানীং বোম্বাই ফিল্মি জগৎকে এনামে প্রায় অনেকেই ডাকছে, 'হাতি মেরে সাথী' বা এ-ধরনের অন্য কোনো ছবির নায়ক হতে পারে না।

টারজান দুহাত মুখের কাছে এনে শাঁখের কায়দায় শব্দ করলেই তার পোষা গজরাজ তাকে পিঠে তুলে নেয়ার জন্যে হাজির হয়ে যায়। তার একটি শিপাঞ্জি বন্ধুও আছে। সেও যথেষ্ট বুদ্ধিমান। তবু টারজান নিজেই তো একশো। আর কারোকে তোয়াক্কাই করে না। কিংবা 'হাতি মেরে সাথী'র রাজেশ খান্না বা আরও পরে 'ম্যায় আউর মেরা হাতি' বা এরকম কি একটা ছবিতে হাতির পিঠে মিঠুন চক্রবর্তী—সেও যেন আর এক টারজান। সাবু নিজেকে এখন সে রকম রাজেশ খান্না বা মিঠুন ভাবে। দূরে হাতিরা স্থির।

সাবু তার 'র‍্যামবো' লেখা গেঞ্জি গায়ে, বুক চিতিয়ে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়ায় ও বিনীতভাবে যূথপতির সাক্ষাৎকার নিতে চায়। এ কথোপকথন যদিও ঘটে, কি ঘটে না, তবু লেখা হয়।

আমরা বিদ্যুৎ বয়ে যাওয়া তারের বেড়া ছিঁড়ে ফেলেছি। বলতে-বলতে হাতি দলের শুঁড় তোলা নেতা যেন শাঁখ বাজিয়ে দেয়।

সাবু বলে, বেশ করেছ।

দাঁতালটি তার মাথার কাছে শুঁড় তুলে এনে চিৎকার করে ওঠে। শেষ রাতের চাঁদও বুঝি কেঁপে ওঠে সেই শব্দে।

একটু ছমছম করে উঠলেও সাবু কিন্তু ভয় পায় না। সে এরকম অনেকবার দেখেছে ভিডিও-তে। সিনেমায়। নায়কদের দেখলেই হাতিরা সেলাম করে। ডাকে। নতুন কিছু এর মধ্যে নেই তো। এমন কি সাবুর জন্মের অনেক অনেক বছর আগে, যদি গোড়ায় যে বয়েস বলা হয়েছে সাবুর, সেটাকেই অভ্রান্ত ধরেনি, তাহলে 'মুনিমজি' বলে একটি সিনেমায় নায়ক দেবানন্দও প্রেমে, তখনকার মতো ভিলেন

দমনে হাতির সাহায্য পেয়েছিল, তাও সাবুকে জানাতে হয়।

সাবুকে বড় দাঁতালটি যা বলতে চায়, তা এরকম—দলমার হাতি যাতে লোকালয়ে চলে আসতে না পারে তার জন্যে ১৯৯১-তে কুড়ি কিলোমিটার জুড়ে তারের বেড়া দেয়া হলো। অ্যানালাইজার বসানো হলো সিঁদুরিয়ার কাছে। এর মধ্যে দিয়ে যায় মাঝারি ধরনের বিদ্যুৎ তরঙ্গ।

হাতি আটকে গেল প্রথম প্রথম। তারপর তাকে খানিকটা 'জুরাসিক পার্ক'-এর স্টাইলে বড় দাঁত দিয়ে তার ছিঁড়ে নয়তো গাছের গুঁড়ি ফেলে তারের খুঁটি লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে বিদ্যুতের বেড়া টপকে আসতে দেখা গেল।

আমরা বেড়া টপকাতে শিখলাম—দাঁতালটি বলে যাচ্ছিল।

দলমা পাহাড়ে গাছ কমে আসছে। খাবার কমে যাচ্ছে। বাঁকুড়ার জঙ্গলে হাতিদের আঁতুড় হলে, সেখানে কচি কচি ঘাস। বাঘের ভয় নেই। বাচ্চারা সবুজ ঘাসে তাড়াতাড়ি বাড়ে। আমরা তো ছিলাম আগে বাঁকুড়ায়। এখন দলমার সবুজে। দলমা পাহাড় জুড়ে আছে ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ অরণ্যের সঙ্গে।

কে যেন বলছিল, তোমরা নাকি চিলকিগড়, ধলভূমগড়, সিংভূম, মানভূম, নয়াগ্রাম, ঝাড়গ্রামের রাজাদের হাতির কেউ কেউ? রাজারা তাদের রাজত্ব চলে যাওয়ার পর জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে গেছে তোমাদের। তারপর দলমার হাতি আর রাজাদের হাতি—সব মিলে মিশে একটা কিছু—নতুন কিছু? সাবু তার হাফ প্যান্টের দু-পকেটে হাত ঢুকিয়ে প্রশ্নের সঙ্গে স্মার্ট হওয়ারও চেষ্টা করছিল।

চাঁদ ডুবে আসছিল।

প্রশ্ন শুনে শুঁড় নামিয়ে নিল দাঁতাল দলনেতা। চুপ করে রইল। উত্তর দিল না। হয়তো তার পায়ে এখন শেকল বাঁধার সেই দাগ, ঘায়ের চিহ্ন। নাকি তার মনে পড়ে গেল অন্য কোনো কথা। সে কি তার আদিপুরুষ ম্যামথকে দেখতে পাচ্ছিল? যেমন দর্ভপাণি সেই বাঁশবনের ভেতর অন্ধকারে যদি একটা ম্যামথ পাই সামনে, লোমশ—

বড় দাঁত, কিংবা স্টেগাডন গণেশ, যার চোয়াল রাখা আছে ভারতীয় জাদুঘরে, এমন ভেবেছিল, তেমনই কোনো স্মৃতির ব্যথায় হয়ত বা দলপতি চুপ করে গেছিল।

আকাশে চাঁদ তেমনই জ্যোৎস্না বিতরণে ব্যস্ত ছিল। শীত লাগছিল সাবুর। এ-হাতিরা কি রাজার, নাকি দলমার? সাবু নিজেকেই নিজে জিজ্ঞেস করল। তারপর হঠাৎই মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে—ও গণেশ, গণেশ-বাবা গো। আমার মায়ের বাতের ব্যথাটা যেন সেরে যায়, আর আমাদের গাইটার যেন এবার, একটা বকনা বাছুর হয়—এমন প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে সাবু সেই শীতের বিশাল ফসলহীন মাঠের ওপর নিজেকে সাষ্টাঙ্গে শুইয়ে দেয়।

আকাশে চাঁদ তেমনই জেগে থাকে। পনেরো ষোলো গজ দূরে দাঁড়ান দাঁতাল ও তার সঙ্গী-সঙ্গিনীরা প্রায় সবাই আকাশের দিকে শুঁড় তুলে সাবুকে গার্ড অব অনার দেয়।

মহাভারতের যুগ কিংবা রামায়ণের কাল হলে নিশ্চয়ই এসব ঘটনায় অবধারিত স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতো। বেজে উঠত অলৌকিক-দুন্দুভি আর কাড়া-নাকড়া। --সত্যি-ই সে রকম একটা কিছু হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরিই হয়ে যায়। সাবু হয়তো ঠিক বুঝতে পারে না। সে সব ভুলে গিয়ে গণেশবাবার কাছে প্রার্থনা করতেই থাকে। আর এতগুলো দলমলে হাতি, তারা সব ভুলে গিয়ে যদি ডেকে ওঠে?

ডাকে না। কিন্তু শুধু তাদের শুঁড় রাইফেলের নল হয়ে চাঁদের দিকে তাক করা থাকে।

আর আমরা, যারা এই লেখা পড়ছিলাম বা পাতা উল্টোচ্ছিলাম, তারা সব ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করি। সাবুকে। সাবুর নেয়া সাক্ষাৎ-কারকে। এমনকি সেই দলপতি দাঁতালটিকেও—যে এখনও শূন্যে শুঁড় তুলে স্থির।

৩। হাতি লালুর না কাঁসিরামের।

ময়দানের জন সমাবেশে ব স পা—বহুজন সমাজ পার্টি এমন নামেই পরিচিত হিন্দি বলয়ে, যাকে কি না গো-বলয়ও বলে থাকে সংবাদ মাধ্যম, আরও সোজা করে বললে মিডিয়া. যেমন ভারতীয় জনতা পার্টির পরিচয় ভা জ পা, মুলায়ম সিংহের দলকে সংক্ষেপে স পা, একদা চৌধুরি চরণ সিংয়ের দলিত মজত্বর কিষাণ পার্টি পরিচিত ছিল দ ম কি পা নামে—সেই বহুজন সমাজ পার্টির ঝাণ্ডায় নীলের ভেতর শাদায় আঁকা হাতি, এমনকি কলকাতায় রাস্তার পাশে দেয়ালে দেয়ালেও লেখা হয়েছিল—'জাতি তোড়ো সমাজ জোড়ো', পাশে হাতির ছবি ও বড় অফসেটে ছাপা পোস্টারে পাকা চুল টেনে টেনে টাক ঢাকা কাঁসিরাম। যার নিচে লেখা—'মান্যবর কাঁসিরামজি।'

অমিতাভ বচ্চনের বিরুদ্ধে এলাহাবাদ এম পি সিটে কাঁসিরাম দাঁড়িয়েছিলেন হাতি নিয়ে। এলাহাবাদের দেয়ালে দেয়ালে তখন নীল রঙে কিংবা অন্য রঙে আঁকা ছোট বড় নানা সাইজের হাতি। বহুগুণা—ডক্টর হৈমবতীনন্দন বহুগুণা জনতা পার্টির ক্যানডিডেট। সেবারই কি কাঁসিরাম, না তারপরের বার—রাজাসাব, মাণ্ডার রাজা ভি পি সিং যেবার জনতা পার্টির প্রার্থী ছিলেন, সেবার কংগ্রেসের হয়ে সুনীল শাস্ত্রী—লালবাহাত্বর শাস্ত্রীর ছেলে, সেবারই কাঁসিরাম ক্যানডিডেট—কিছুই ঠিকঠাক মেলাতে পারছিল না সুবিমল।

কপালে একবার রুমাল বুলিয়ে নিয়ে সামনে বসা দৈনিকের নবীন সাংবাদিকটিকে রসিকতা মিশিয়ে কিছু একটা বলতে গিয়ে বারে বারে তার গলা আটকাচ্ছিল। শেষ অব্দি সুবিমল খানিকটা চুপ করে থেকে কথার মোড় অন্যদিকে ঘোরাতে চাইল। আসলে সাংবাদিকটি 'লালু'র হাতি কিনা, এমনটি জানতে চাওয়ায় সুবিমল ভেবেছিল, লালুপ্রসাদ যাদবের কেন, সে তো কাঁসিরামজিরও হতে পারে—এরকম কিছু একটা বলে দেবে। কিন্তু তা আর বলা গেল না।

সুবিমল সাংবাদিকটির দিকে তাকাল। কাল সারা রাত আবারও কোনো ফসলহীন নিষ্প্রদীপ মাঠের ভেতর, মাথার ওপর চাঁদ সাক্ষী

করে, দলমা-দলকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া, দূরে। আরও দূরে। আরও দূরে। পশ্চিমের পথে। গঙ্গা নদীর পুব পারের মানুষ বুনো হাতির শুঁড় ল্যাজ দাঁত পা কিছুই দেখতে পেলনা, তার আগেই তারা দলমা ফিরে চলল।

বেশি রাতে ব্যাণ্ডেল, মগরা, পোলবা পেরিয়ে—শুক্রবার তো সারারাত হেঁটেছে দামালেরা, তারপর শনিবার সকাল নটা নাগাদ জামালপুর চকদিঘির কাছে দামোদর পেরিয়ে ওদিকে গেলে প্রশাসন হয়তো বা লম্বা করে নিশ্বাস নেয়ার সুযোগ পায়।—যাক বাবা, বাঁচা গেল। তাহলে ওরা সত্যি সত্যি ফিরে যাচ্ছে।

তারপর খবর আসতে থাকে বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার জয়পুর, পেরিয়ে ওরা চলেছে দলমার দিকেই। আর সিমলিপাল? সেখানেও তো জঙ্গলে হাতি থাকে। দলমা পেরিয়ে ওরা সিমলিপাল যাবে কি? এমনটি জানার ইচ্ছে হলো সাবুর।

হাতিরা সারাদিনে প্রায় আশি কিলোমিটার হেঁটেছে। সাংবাদিকটিকে এর বেশি আর কিছু বলতে ইচ্ছে করছিল না সুবিমলের। তার মনে পড়ল কাল রাতে জি টি রোডের ওপর ব্যাণ্ডেল ছাড়িয়ে ছোট খেজুরিয়া লেভেল ক্রসিংয়ের কাছে রাত আটটা নাগাদ বড় রাস্তার ওপর জ্বালানো টায়ারের আগুন। আলো। ধোঁয়া। রবার পোড়া গন্ধে ভারি বাতাস।

কোথাও আলো নেই। চলে যাওয়ার আগে শুঁতো দিয়ে দিয়ে খুঁটি উপড়ে দিয়ে গেছে হাতিরা। গ্রামের শীত, ফসলহীন ন্যাড়া ধু ধু মাঠে তাই খড়ের আগুন। আগুন কাঠের, টায়ার জ্বালিয়ে। চারদিকে পটকার শব্দ। তার আলো। কোনো এক সবেবরাত বা দেওয়ালি।

মাইক লাগান জিপ নিয়ে অনবরত পাক খাচ্ছে পুলিশ। হাওয়ায় ভেসে আসছে, আপনারা যাঁরা পাকা বাড়িতে আছেন থাকুন। যাঁরা মাটির বাড়িতে রয়েছেন, তাঁরা ফাঁকা জায়গায় চলে যান। একথা বার বার বলা হচ্ছে।

আর হাতি দেখার খবর—সে তো আসতেই থাকছে।

কেউ যদি-বা হাতির পায়ের নিচে একেবারে থেঁতো, দলামোচড়া হয়ে যায়—তাকে দেখার জন্যেও ভিড়ের অভাব নেই।

সাংবাদিকটি আরও বুঝি কিছু জানতে চাইছিল। তার সেই রাতের অভিজ্ঞতা যদি বলে সুবিমল।

সবই তো বেরিয়ে গেছে ভাই—বলতে বলতে সুবিমল কী একটা ফোনের ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

সাবু বলল, নতুন কথা কিছু যখন জানা যাবে না, তাহলে আমি যাই। বলে হাতের উল্টো পিঠে নাক মুছল সাবু। বেশ ঠাণ্ডা লেগেছে এইভাবে হাতির ল্যাজে ল্যাজে ঘুরে।

হাতি পোষার খরচ যেমন, হাতি তাড়ানোও তার কিছু কম নয়। হুলা পার্টির পচা মাহাতর সঙ্গে কথা বলে এরকম খানিকটা তথ্য জানতে পারে প্রদীপ। হাতি শহরের দিকে চলে আসছিল। এখন ফিরে যাচ্ছে বনে।

ছেলে গেছে বনের মতো—হাতি ফিরল বনে, প্রদীপ তার কপিতে একটু কাব্যি করার কথা ভাবল।

পচা মাহাতর বাড়ি বাঁকুড়ায়। বেলেতোড় থেকে একটু ভেতরে আশতোড়া গ্রামে। হাতি তাড়ানোর হুলা পার্টির খরচ বাবদ তার এখন রোজকার পাওনা আড়াই হাজার টাকা। তা সে খরচ কম নয়। হুলা পার্টির পচা মাহাত ব্যাপারটা এভাবে ভেঙে বলে প্রদীপকে।

কেরোসিন তেল, মশাল জ্বালতে প্রতিদিন পোড়ে তিনশো থেকে পাঁচশো লিটার—তার দামটা একবার ধরেন। এরপর বাজি পটকার খরচ, তাও নেহাত কম নয়। প্রতিটি খেদায় অন্তত শ-আড়াই টাকার পটকা ফাটাতে হয়। হুলার সর্দার পাবে আশি টাকা। অন্যরা পনের টাকা কম, পঁয়ষট্টি টাকা। এ ছাড়া খোরাকি আছে, সেও সাত-আটশো। আড়াই হাজার টাকা চল্লিশ পঞ্চাশ জন ভাগ করলে কত দাঁড়ায়!

মার্চ থেকে নভেম্বর—পচার সিজন। তখন হাতি তাড়ানোর কাজ থাকে, কথায় কথায় জানতে পারে প্রদীপ।

শীতের দুপুরে পচা মাহাত তখনও খালি গায়েই। তার মাথায় একটি গামছা, কোমরে শর্ট প্যান্ট। খালি পা। সেই শীতে ফেটে হাঁ হয়ে থাকে। গায়ের তেলহীন চামড়া—হাতে-মুখে খড়ি ওঠা। হাওয়ায় ফাট ধরার চিহ্ন। তবু পচা দাঁড়ায়। দিগন্তে রোদ ঝলসানো সূর্যের প্রতাপে তার শরীরটি আরাম পেলে, পেছনে চলমান পাহাড়েরা অথবা মেঘদল ভেসে ওঠে। সেই সব হাতিদের সার বেঁধে, পাশাপাশি চলে আসার ভেতর প্রদীপ হয়ত সমুদ্রের ঢেউও দেখতে পায়।

পচা তার হুলা পার্টির লোকজন নিয়ে হাতিদের ডেকে যেতে থাকে বনের দিকে। যে বনপথ তারা ভুলতে চেয়েছিল, কিংবা চায়নি—সে রাস্তাতেই ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

প্রদীপের তখনও ঘোর কাটে না। এমনকি ডি এফ ও যখন অন্যান্য সাংবাদিকদের সঙ্গে তাকেও ডেকে বলে, একটা বড় খবর হতে পারে। গিলাবনির জঙ্গলে যে হাতিরা ঢুকতে চলেছে, তাদের মধ্যে একটা মেয়ে হাতির পেটে বাচ্চা রয়েছে। সম্ভাবনা আছে বাচ্চা হয়ে যাওয়ার। যাকে বলে অ্যাডভান্সড স্টেজ।

তারপর এক সময় দিগন্তে সূর্য ডুবে গেলে পচা মাহাত ও তার হুলা পার্টি রে-রে করে আকাশে আগুন ছোড়ার কথা ভাবছিল। আবারও হাতি তাড়াতে তাড়াতে এগোতে হবে। ডি এফ ও শেষ বেলার রোদে ঘেমে উঠছে। তার হাতের পাঁচ 'প্যান্থার', 'টাইগার', 'চিতা', 'রাইনো', 'লায়ন' নামের আলাদা আলাদা বনকর্মীরা হাতি তাড়াতে তাড়াতে সকলেই প্রায় নাকাল।

ডি এফ ও-র কপালে ভাঁজ—হাতিটি মা হয়ে গেলে তো মুশকিল তাহলে তো বিতাড়ন বন্ধ—অন্তত দিন দুই তিন।

আর এখানে ডি এফ ও-র পাশে আবারও সাবুকে আমরা দেখতে পাই। তার পরনে 'র‍্যামবো' ছাপ সুতির ফুলহাতা মোটা গেঞ্জি, হাফ প্যান্ট। খালি পা। সাবু কেমন করে যেন খবর পায় হাতিটি মা হবে।

ওয়্যারলেসে খবরও যেতে থাকে। রিপোর্টাররা কাগজ কলম, নোট বই নিয়ে তৈরি হয়ে যায়। ফোটোগ্রাফাররা তাক করে ক্যামেরা।

হাতির বাচ্চা হলে পচা মাহাতর তিন দিন ছুটি। চুপ করে বসে থাকা হুলা পার্টি নিয়ে। আর শেষ রাতে বৃংহণের শব্দে, হয়তো আনন্দে বা যাতনায় হাতিটি মা হয়ে গেলে জঙ্গলের মধ্যে তাকে আর তার বাচ্চাকে ঘিরে তৈরি হয় এগারোটি হাতির দেয়াল। সবার আগে সেই দাঁতাল-দলপতি। যে কিনা হুগলির খোলা মাঠে সাবুকে বলেনি সে আসলে কে? রাজার হাতি না বনের!

পেটের ভেতর চব্বিশ মাস থাকে বাচ্চা, নাকি উনিশ থেকে একুশ মাস—এমনও তো মত কারও কারও! সেই সব হিসেব নিয়ে কথার কাটাকুটি চলে।

পৃথিবীর কোনো এক কোণে কত মানুষ, হুলা পার্টির চোখে চোখে জঙ্গলের ছায়া, এসব দেখে বা না দেখে বাচ্চাটি তার মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। হয়তো সে ভয় পাচ্ছিল। তার চোখে নতুন পৃথিবীর চেহারা। এতজন ছুটে আসা মানুষ, তাদের রই-রই চিৎকার, সবটাই কিছুক্ষণের জন্যে থেমে গেছে।

সাবু এবার পচা মাহাতর সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলবে।

আমাদের এই লেখার আগের সূত্র তো ছিল সাবুকে ভুলে যাওয়া। তা কিন্তু হলো না। আমরা তো এও চেয়েছিলাম সাবু অন্তত হাতি কার, লালুর না কাঁসিরামের—সেই বিতর্কে না ঢুকুক। কিন্তু তা আর হলো কই!

পচা শীত আটকাতে রাতে একটা জামা গায়ে দিয়েছে। মাঠের ওপর খড়-কাঠ জ্বালানো আগুন। সেই আগুনের ধোঁয়া ছাই অন্ধকারে আলাদা করে চোখে পড়ে না।

পচাদা, নাহ্, অবাক হওয়ার কিছু নেই। সাবু তো পচাদা বলতেই পারে—সে তো সকলের ভাষাই জানে।

হ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ—পচা মাহাত হয়ত কোনো গভীর থেকে উঠে আসে।

পচাদা, কি রকম ক্ষতি হলো এই সব গাঁ-গেরামের ?

খুব। খুব হয়েছে। ধান গেল। আলু গেল। হাতির পায়ের নিচে সব আলু খেত সাবাড়। মাঠ হয়ে গেল। বলতে বলতে পচা যেন দূরের আকাশ দেখছিল। সেখানে অনন্ত উধাও কোনো রণভূমি। তার গায়ে তারাদের জেগে থাকা।

পচা মাহাতর মনে পড়ছিল কবে শোনা একটি গান

কাঁড়ার পারা মেঘ ঢুঁসাইনছে
আকাশে
শাদা খরিস হিঁস্ হিঁসাইনছে
বাতাসে
এমন দিনে মরদ গেছে ভজুডিহির হাটেতে
ননা সোনা আর কাইন্দ্য না…

এতো বর্ষার গান। তবু এই শীতের সন্ধ্যাতেও পচার মনে পড়ছিল। আজকাল গ্রামেও প্রায়ই ক্যাসেটের গান বাজে।

হাতির পায়ের নিচে থেঁতো হলো কতজন মানুষ! কত টাকা, কত সময়। এমন কি এই তো কালই পচার হুলা পার্টির একটি ছেলে, তাকে হাতির শুঁড়ে জড়িয়ে ধরে প্রায় আছাড় মারার অবস্থায় তুলে নিলে সে তার হাতের শিকটি হাতির নরম শুঁড়ের গোড়ায় ঢুকিয়ে দিলে, বিকট চিৎকার করে সঙ্গে সঙ্গে তাকেও তাড়াতাড়ি মাটিতে নামিয়ে দেয় গজরাজ—পচা মনে করতে পারছিল।

সাবু মুখোমুখি বসেছিল পচার। জঙ্গলে দলবাঁধা হাতিরা। আকাশে চাঁদের আলোবাহার। ডি এফ ও সাহেব যা অর্ডার ইত্যাদি দেয়ার দিয়ে ফিরে গেছেন তাঁর কোয়ার্টার্সে। এখন আর অপারেশন হবে না। শুধু খোলা আকাশের নিচে সবাই মিলে শুয়ে থাকবে পচা মাহাতরা। সঙ্গে সাবু একটু দূরে আগুনের কাছে দাঁড়িয়ে কত কী ভেবে নিতে পারছিল। যদি দাঁতালটি নড়ে-চড়ে তাহলে তো দলও নড়বে। আর দল নড়লে তার পেছন পেছন পচা মাহাতরা। হুলা পার্টির তো এমনই নিয়ম। ভাবতে ভাবতে মাটিতে বসে পড়ে

কাঠের আগুনে হাত সেঁকছিল সাবু। সেই আগুনের তাপ গালে, গলায়, মুখে ছুঁইয়ে আরাম নিতে চাইছিল। অফিসারদের হুকুম ছিল রাতে আগুন জ্বালা যাবে না। কে শোনে কার কথা!

আগুন না পোয়ালে শীত মানে! বাবুদের আর কি!

যদি হাতি চলে যায় দূরে! তাহলে রোজগারও শেষ—এমন ভেবে পচা মাহাত কাঠের আগুন নিভিয়ে দিতে বলল। তার নিজের আশতোড়ার মাটির ঘর, বৌ তারামণি, চারটে ছানা—সব একাকার হয়ে যাচ্ছিল চোখের সামনে।

৪। সাবু ও পালকাপ্য

গজশাস্ত্র নিয়ে কাজ কারবার এই ভারতবর্ষে অন্তত দু হাজার বছর ধরে চলে আসছে। হাতি বিষয়ে নানা জিনিস শেখার ব্যাপারটিও তার সঙ্গে সঙ্গে। অনেক অনেক দিন আগের পালি জাতকের নানা কাহিনীতে এর কথা বলা আছে। পালি জাতকে হাতিকে নানান বিদ্যা শেখানোর ব্যাপারে আসল যে বই, সে বইয়ের কথা লেখা রয়েছে। হাতিদের যাঁরা শিক্ষা দিতেন, তাঁরা সম্মান পেতেন যথেষ্ট। গজশাস্ত্র ছাড়াও তাঁদের বেদ পড়তে হতো।

একটি জাতক কাহিনীতে বুদ্ধ এরকম একটি পরিবারে জন্মে যোগ্যতার সঙ্গে তাঁর সমস্ত কাজ মন দিয়ে করেছিলেন।

সাবু এত সব জানতে চায় নি। সে আসলে পালকাপ্য মুনির মুখোমুখি হতে চেয়েছিল এই দুধেলা জ্যোৎস্নায়। অগ্নিপুরাণের ২৮৭ অধ্যায় থেকে উঠে এসেছিলেন পালকাপ্য? যাঁর জন্ম হাতিনীর পেটে।

পালকাপ্য ঋষি আর আমাদের সাবু এই অলৌকিক জ্যোৎস্নায় মুখোমুখি হয়ে যায়।

পালকাপ্য—মহাভারতকার বেদব্যাস জানিয়েছেন মহামতি নকুল ছিলেন অশ্বচিকিৎসায় পারদর্শী। সত্যি বলতে কি ঘোড়ার ডাক্তার—

সাবু—আর আপনি?

পালকাপ্য—আমি তো হাতির—

সাবু—হাতির কি?

পালকাপ্য—হাতির ডাক্তার।

সাবু—আপনাকে কি এজন্যই মুনি বলা হয়?

পালকাপ্য—হবেও বা—তবে এসব কথাই তো লেখা আছে অঙ্গরাজ রোমপাদ ও আমার সঙ্গে কথাবার্তার ভেতর। গ্রন্থটি প্রাচীন। তখন অঙ্গদেশ দেওঘর থেকে গঙ্গার পশ্চিম পাড় ধরে এখনকার ভুবনেশ্বর পর্যন্ত ছড়ান।

সাবু জ্যোৎস্নায় আবছা মতে পালকাপ্যকে দেখতে পায়। মাথায় বড় বড় চুল, তেমন লম্বা নন। মঙ্গোলিয়ান মুখ।

সাবু জানেনা কানিংহাম সায়েব ভাগলপুরকেই অঙ্গদেশের রাজধানী চম্পা বলেছেন। তার এ-ও জানা নেই ময়মনসিংহের মহারাজ শশীকান্ত আচার্য দক্ষিণ ভারতে পণ্ডিত পাঠিয়ে মূল পুঁথির অনুলিপি করিয়ে অনুবাদ করান। তারপর তখনকার প্রচলিত আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথি, অ্যালোপ্যাথি আর দেশি মাহুতদের ব্যবহার করা ওষুধ নিয়ে তৈরি হয়েছিল গজায়ুর্বেদ সংহিতা।

পালকাপ্য বলছিলেন, হাতিদের এই যে লোকালয়ে চলে আসা, এ যেমন আধুনিক এক বিকার, তেমনই রয়েছে তাদের আরও নানা রোগ—অজীর্ণ, ব্যাপদ, লোমপাত, গ্রহদোষ, মন্যাগ্রহ, জহরবাত, কনটবাত, রসবাত, গিরাবাত।

তা রোগ হলে স্যারমুনি—সাবু পালকাপ্যকে কি বলে সম্বোধন করবে বুঝতে পারছে না—

ধরো, জহরবাতে এক পো মদ, তার সঙ্গে এক পোয়া নিম পাতার রস, চিরতার জল আধ পো, হুঁকোর জল এক পো ভালো করে মিশিয়ে উঁচু হয়ে ওঠা জায়গায় প্রলেপ দিতে হবে। শুধু আমার গজশাস্ত্রই নয়—পালকাপ্য মুনি বলে যাচ্ছিলেন, জ্যোৎস্নায় তাঁর নরুন চেরা চোখ, একটু বসা নাক, সাজানো দাঁত, হলদেটে চামড়া মোড়া মুখ একটু একটু করে নড়ে উঠল—ধরো, ব্যাসদেব ও বৈশম্পায়ন

দুজনেই খানিকটা খানিকটা করে গজশাস্ত্র।

শীতের বাতাসে টান ধরে চামড়ায়। ভেতর পর্যন্ত হি-হি করে ওঠে।

'র‍্যামবো' লেখা গেঞ্জি পরা সাবু এই রাতে, চাঁদের আলোর নিচে একটু একটু করে কেঁপে উঠল। তার ঠাণ্ডা লাগছে।

পালকাপ্য মুনির কোনো বিকার নেই। তিনি আবারও অঙ্গদেশ প্রসঙ্গে ফিরে গেলেন। এখনকার বিহারের ভাগলপুর আর মুঙ্গের ছিল অঙ্গরাজ্যের ভেতর। ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম ছিল অঙ্গ। গৌতম বুদ্ধ যখন গৃহত্যাগ করলেন, তখন অঙ্গ মগধের মধ্যে। আর বিম্বিসার তার রাজা।

বলতে বলতে পালকাপ্য মুনি আকাশের দিকে তাকালেন। জ্যোৎস্না পড়ে থাকা আকাশের গায়ে একটি দুটি তিনটি তারা। সেই নক্ষত্রদের দেখতে দেখতে কি এক দীর্ঘশ্বাস বুঝি বেরিয়ে এলো পালকাপ্যের বুক ভেঙে—অজাতশত্রু যখন যুবরাজ, তখন তিনি অঙ্গের শাসনকর্তা—পালকাপ্য বলে যাচ্ছিলেন—

আপনি এত জানেন মুনিবাবু! সাবু অবাক অবাক মুখ করে দেখে নিতে চাইল পালকাপ্যকে।

পালকাপ্য থামলেন না। বলতে লাগলেন, ঋগ্বেদে অঙ্গের উল্লেখ নেই। কিন্তু অথর্ববেদে অঙ্গবাসীদের বলা হয়েছে ব্রাত্য। তাদের বসবাস ছিল শোণ আর গান্ধার অববাহিকায়। পাণিনিও অঙ্গদেশকে বঙ্গ, কলিঙ্গ ও পুণ্ড্রের সঙ্গে মধ্যদেশের অন্তর্ভুক্ত বলে বর্ণনা করেছেন। মহাভারতে আছে বলি রাজের মহিষী সুদেষ্ণার ছেলে ঋষি দীর্ঘতমসের বংশধররা অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চলে বাস করতেন। অঙ্গ ও কলিঙ্গের মধ্যে জাতিগত সাদৃশ্য—

সাবু তাকিয়ে রইল পালকাপ্যর দিকে।

জ্যোৎস্নায় পালকাপ্যর মাথার চুলের বোঝা অন্যরকম মনে হচ্ছে। পালকাপ্য বলে যাচ্ছেন—

অঙ্গরাজ্যের নাম কেমন করে অঙ্গ হলো, তা নিয়ে আছে নানা

কাহিনী। যেমন ধরো মহাভারতের আদিপর্বে। সেখানে পাচ্ছি রাজা অঙ্গের নামেই নাম হয়েছিল এ রাজ্যের। কিন্তু রামায়ণে আবার অন্যকথা। কামদেব বা মদন শিবের অভিশাপে এখানেই অঙ্গ ত্যাগ করে অনঙ্গ হন, তাই এ দেশের নাম অঙ্গ।

রামায়ণ মহাভারতে অঙ্গদেশের কথা তো কতবার! বলতে বলতে পালকাপ্য সাবুর দিকে তাকালেন।

এই নির্জনে, দূরে হাতির দঙ্গল, সেখানে পালকাপ্য মুনির কথা শুনতে শুনতে সাবু দেখতে পেল পালকাপ্যর রোমহীন বুকটি। সুন্দর পেটান চেহারা। এই ঠাণ্ডাতেও গায়ে কোনো আড়াল নেই। মুনিদের কি শীত লাগে না!

রাজা দশরথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু অঙ্গরাজ রোমপাদ, কেউ কেউ আবার তাঁকে লোমপাদও বলেন—ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির সাহায্যে যজ্ঞ করান। তারপর নিজের মেয়ে শান্তার সঙ্গে বিয়ে দিলেন মুনির।

দুর্যোধন তো কর্ণকে অঙ্গরাজ্যের রাজাই করে দিলেন, সে কথা তো প্রায় সবাই জানে।

অঙ্গরাজ রোমপাদের সঙ্গে আপনার অনেক কথাবার্তা, টীকা-টিপ্পনী—এসব নিয়েই তো গজশাস্ত্র—তাই না? সাবু জানতে চাইল।

শুধু আমার 'গজশাস্ত্র' বা 'হস্ত্যায়ুর্বেদ'-ই নয়, ধরো নীলকণ্ঠের 'মাতঙ্গলীলা'—সেটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ বই, এইসব সাহেবরা হাতিটাতি নিয়ে লেখা কিংবা বোঝার বহু বছর আগে সে বই তৈরি হয়েছে। আমি আর নীলকণ্ঠ—

উত্তুরে হাওয়ায় পালকাপ্যের গম্ভীর, স্পষ্ট স্বর ছিঁড়ে গিয়েও আবার নিজে থেকেই জুড়ে গেল—আমরা হাতির যে তিনটি ভাগ করেছি, তা এরকম—ভদ্র, মন্দ, মৃগ। যাদের হরিণ বলা হয় তাদের যেমন হালকা শরীর, হরিণের মতোই অনেকটা—লম্বা লম্বা পা—আজকের মাহুত-লবজে মিরগা বাঁধ বলা হয়। হংসদেবের 'মৃগপক্ষী-শাস্ত্র'তে ভদ্র, মন্দ ও মৃগ সমেত তের রকম হাতির কথা বলা হয়েছে।

ভদ্র মানে এখানে উত্তম—ভালো। মন্দ মানে ধীরে। যেমন বলা হয় না, মৃদুমন্দ বাতাস বা মন্দ মন্দ বাতাস বহিতেছে।

হাতির শরীর খারাপ হলে—পালকাপ্য বলে যাচ্ছেন।—আগেই তো বলেছি, আবারও বলি—

সাবু—শুনছ তো ?

হ্যাঁ, শুনছি।

হাতির শরীর খারাপ হলে গাঁজা বা ভাঙ, ধুতরো ফল আর পাতা, গুঁড়ো খয়ের, আদা, জায়ফল, এলাচের গুঁড়ো, চিরতা, তেঁতুলের শাঁস, গুড়—আরও অনেক রকমের মাহুতি ওষুধ এদেশে চলে।

আচ্ছা, শ্রীলঙ্কার হাতি নিয়ে এমার্সন টেনেন্ট-এর যে বই, তাতে আছে হাতি লাফাতে পারে—সাবু জানতে চাইল।

এরকম ভুলভাল তথ্য আছে অনেক। পালকাপ্য বলে যাচ্ছিলেন। এই ধুনধ্লাসা জ্যোৎস্নায়—হিন্দিতে ঘোলাটে জ্যোৎস্নাকে এমনই বলে, পালকাপ্যর মনে পড়ছিল পাশ্চাত্য হস্ত্যায়ুর্বেদের প্রথম বই ডব্লু গিলক্রিস্ট-এর। এছাড়া জি. ই. ইভান্স-এর 'এলিফেন্ট অ্যান্ড ছ ডিজিজ।' ইভান্স হাতির দেশিয় চিকিৎসা পদ্ধতি জায়ফল, ধুতরো ফুল, ধুতরো পাতা, আদা, গুঁড়ো খয়েরের সঙ্গে বাইকারবোনেট অফ সোডা, সালফেট অফ কপার, এপসম সল্ট, ক্যাসটর অয়েল, আর্সেনিকের কথাও বলে গেছেন। লিখেছেন তাঁর বইয়ে।

সাবু পালকাপ্যর দিকে তাকিয়ে—হ্যাঁ, কি যেন বলছিলেন, হাতির লাফ—

টেনেন্ট লিখেছিলেন, ন ফুট পর্যন্ত উঁচু বেড়া লাফিয়ে পার হয় হাতি। কিন্তু হাতি তো লাফাতে পারে না। কারণ কোনো ভাবেই চারটে পা মাটি থেকে তুলে ধরেছে হাতি, এমন তো হয় না। আর জি. পি. স্যান্ডারসন, মিলরয়ের বই আধুনিক গজ বিজ্ঞানের।

দূর থেকে খানিকটা খানিকটা ঠাণ্ডা বাতাস সাবুকে শীত পাইয়ে দিচ্ছে।

কথা বলতে বলতে পালকাপ্য কিন্তু তেমনই দাঁড়িয়ে। এতক্ষণে

চোখ সয়ে যাওয়ার পর সাবু আবারও দেখতে পেল তাঁর গায়ে কোনো আবরণ নেই। হলদেটে রোমহীন বুকটিতে জ্যোৎস্না পড়ে অনেকটা যেন নদীর বালির ওপর চাঁদের আলো পড়লে যেমন রঙ হয়ে যায় সেই রকম রঙ তৈরি করেছে। সাবুর মনে পড়ল একটু আগেই পালকাপ্য বলছিলেন, চম্পা ছিল অঙ্গদেশের রাজধানী। এখনও ভাগলপুরের কাছে সেই চম্পার খোঁজ পাওয়া যায় বোধহয়। চম্পাকে চম্পাপুরী বা চম্পানগরীও বলা হতো। মহাভারতে, অনেক অনেক পুরাণে তার নাম মালিন বা মালিনী। আবার চাঁদ সওদাগরের চম্পকনগরী—সেও তো আছে, জান তো! 'এসবই হয়ত আলাদা। কিংবা কল্পনার রঙে এক।

পালকাপ্য কত কি জানেন—সাবু মনে করল।

ঋষি বলছিলেন, গৌতম বুদ্ধ আর মহাবীর—দুজনের জীবনেরই অনেক ঘটনার সঙ্গে চম্পা জড়িয়ে। বৌদ্ধ, জৈনরা তাই চম্পাকে খুবই পবিত্র মনে করেন। ওঁদের তীর্থক্ষেত্র।

সাবু পালকাপ্য ঋষির বর্ণনায় সেই প্রাচীন চম্পা নগরী দেখতে পাচ্ছিল। এই জ্যোৎস্না লাগা অন্ধকার, ফাঁকা ধু ধু মাঠ, দূরে দাঁড়ানো পাহাড় পাহাড় হাতিরা—সব মুছে গিয়ে সেই পুরনো জনপদটি—যাকে পঞ্চম নাকি সপ্তম শতাব্দীতে ভারত ভ্রমণে এসে চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন বলেছিলেন, চান্-পো। তখন চম্পা তো ভারতের অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র, শিল্পকেন্দ্র তো বটেই।

পালকাপ্যর কথা মতো সাবু দেখতে পেল সামনে মাথা ন্যাড়া শ্রমণেরা দল বেঁধে যাচ্ছে। কাঠের ভারি চাকার শকট টানছে পুরুষ্টু সব ষাঁড়। রাস্তায় সাজান ঘোড়ার পিঠে রাজপুরুষ। শ্রেষ্ঠীরা। কেনাবেচা চলেছে। বিদেশি বণিক। তাদের পোশাক, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস—সবই অন্যরকম। চষক, ভৃঙ্গারে সুস্বাদু মাধ্বী, শূলপক্ক মাংস, রোটিকা সহযোগে বিশ্রম্ভালাপ করা পুরবাসী।

জমজমাট চম্পা নগরী সামনে থেকে মুছে গেলে সাবু শুনতে পায়, পালকাপ্য বলছেন, তো যা বলছিলাম। স্যাণ্ডারসন, রিলরয় আর

ইভান্স—এঁদের চেষ্টাতেই আধুনিক হস্তিতত্ত্বচর্চা শুরু। এঁদের সময়েই রঙপুর পীরগাছার বড় তরফের জমিদার জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরীর 'হস্তিতত্ত্ব'—রঙপুর থেকে বাংলা ১৩০১ সালে ছেপে বেরয়। তার মধ্যে হাতিদের শরীরের গড়ন—নানা বাঁধ নিয়ে আলোচনা, দাঁত আর ল্যাজ কতরকমের, কী কী—সে সব নিয়েও বহু কিছু লেখা আছে। তারপর ধর শিকারী-লেখক ধৃতিকান্ত লাহিড়ী। অসমের গৌরীপুরের প্রকৃতিশ বড়ুয়া (লালজি) তাঁরাও অনেক কথা লিখেছেন।

ঋষি যে কত জানেন! সাবু অবাক হয়ে পালকাপ্যকে দেখতে চাইল।

ঘোলা জ্যোৎস্নার ভেতর পালকাপ্য বলে যাচ্ছেন, পুব ভারতে জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণকেই আধুনিক হাতি বিশারদের মধ্যে প্রথম বলা যাচ্ছে।

আকাশ থেকে নেমে আসা আলোয় একটু দূরে দলা পাকানো হাতিরা। তাদের পিঠে চাঁদের জলছাপ। সাবু সেদিকে তাকাতেই পালকাপ্যর গম্ভীর গলা শুনতে পেল, আমি এখন আসি—

চম্পার রাজপথে সার বন্দী রাজহস্তী দেখতে পাচ্ছিল সাবু। সেই দীর্ঘ যাত্রায় হাতিরা কেউ কেউ মাথা, শুঁড় নাড়াচ্ছিল। তাদের গলায় বাঁধা ঘণ্টার শব্দ কি মিশছিল বাতাসে! সাবু শুনতে পাচ্ছিল।

তার মনে পড়ল কবে যেন সে শিখেছিল, পালকাপ্যর কাছে নয়, অন্য কোনো জায়গা থেকে—হাতি পুং-এ এসে মাটি খায়। সেই মাটি-ই হলো হাতিদের জোলাপ। এটি না খেলে তার পেটে ময়লা জমে। পোকা-মাকড় বাসা বাঁধে। ফলে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। আবার 'পুং'-এর মাটি যখন শেষ হয়ে যায় তখন নোনামাটি খেতে শুরু করে হাতি। মানুষ যেখানে পেচ্ছাপ করে সেই মাটি। এ জাতের মাটি খেলেও হাতিকে রোগে ধরে। মানে পেটের ভেতর মাটি বসে যায়। তখন হাতির ভেতর হাত ঢুকিয়ে লেদা টেনে বার করতে হয়। কিন্তু তাতেও হাতিকে সব সময় বাঁচান যায় না।

হাতিকে তখন অনেক সময় ছেড়ে দেয়া হয় বনে। স্বাধীন হাতি,

সোজা ঢুকে পড়ে বনের ভেতর। ঘুরতে ঘুরতে খুঁজে পেতে গাছ-গাছড়া খেতে থাকে।

পালকাপ্য কখন যেন মিলিয়ে গেছেন জ্যোৎস্নায়। একলা সাবু দাঁড়িয়ে, আকাশের নিচে।

ক্লান্তিতে তার লম্বা করে হাই উঠল।

দূরে দল বাঁধা হাতিরা তেমনই স্থির।

৫। আহা, যদি হিন্দি সিনেমা হতো

যদি সত্যি সত্যি হিন্দি সিনেমা হতো কিংবা একালের বাংলা সিনেমা, এমনকি সেকালেও—ধরুন না, প্রমথেশ বড়ুয়ার 'মুক্তি', যাতে মেনকা দেবী ছিলেন। আর সেই যে বিরাট হাতিটি, যাকে ঘিরে বেশ জমাট একটা কাহিনী।

পঙ্কজ মল্লিকও অভিনয় করেছিলেন একটি চরিত্রে। 'পাহাড়ি' না কি যেন নাম ছিল তাঁর সিনেমায়। ভরাট গলায় গান গেয়েছিলেন 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে…' এখানে তো তেমন কোনো গল্পই পাওয়া যাচ্ছে না। গল্প একটা খোঁজার চেষ্টা ছিল প্রথমদিকে, কিন্তু সেই সুতোটি বেরিয়ে যাওয়ার পর, সুবিমলের বাড়িতে এসে গল্পের হারানো খুঁটটা খোঁজার চেষ্টা করা যেতে পারে।

হিন্দি সিনেমা, এমনকি বাংলা বক্স অফিস হিট ছবি হলেই হয়তো সুবিমল গানটা জানত। বনের হাতিও শুনত তার কথা। সুবিমল অনায়াসে উঠে যেত হাতির পিঠে। তার বৌ-ও হতো বেশ সুন্দরী। নাচ জানে। গান জানে। তাদের একটি বা দুটি এঁচোড়ে পাকা ছেলে-মেয়ে আছে। যাদের মাথার চুলের কাটিং দেখলেই মনে হয় এখনই ঘাড় ধরে বসিয়ে দি নাপিতের কাঁচির সামনে। তারা বয়সে ছোট। তা হোক, বাচ্চারাও তো ভালো গান জানে। বাবা-মায়ের সঙ্গে কোরাস গায়। আর খুব পাকা পাকা কথা বলে আবার বাঘ-হাতিদের সঙ্গে তার বা তাদের বন্ধুত্ব খুব। জঙ্গলে একা হারিয়ে গেলে হাতি তাকে, তাদের বাঁচায়।

সে যাকগে, সাবু কিন্তু সুবিমলের বাড়ি পৌঁছে যায়।

এখানে বোধহয় চিত্রনাট্য বেশ দুর্বলই হয়ে গেল।

সুবিমল সেনের বউ ইরা দেখতে তেমন কিছু আহামরি নয়। রঙ ময়লা। সুবিমলের এই রাত-বিরেতে হাতি তাড়ানো ইরার কাছে মোটেই বীরত্বব্যঞ্জক নয়, বরং দুশ্চিন্তার। আর একটা কথা, হাতি তাড়ানোর সময় সুবিমলের হাতে বন্দুক ছিল না।

সুবিমল আগের সারাটা রাত হাতি তাড়িয়ে যে দিন ভোরে ফিরল, সেদিন ইরার প্রথম কথা ছিল—সব ঠিক আছে তো ?

ইরা কখনও কখনও হাতির দাঁত, গজমুক্তার কথা ভাবে।

সারা দিনের অনেকটা সময়েই তার মাথায় সুবিমলের অফিসের ভাবনা থাকে। আবার সেই সঙ্গে এই হাতির খেয়ে-পেয়ে আসার মধ্যে ইরা কবে যেন হাতির স্বপ্ন দেখে। যেমনটি বোধহয় দেখেছিলেন মায়াদেবী। এ হাতি শাদা নয়। কিন্তু তার দাঁত আছে।

ইরা কোনো একটি বইতে পড়েছিল সাত রাজার ধন এক মানিক গজমুক্তা। ইরা বই ওল্টাতে ওল্টাতে জেনেছে—সব হাতির মাথার ভেতরই যে গজমুক্তা পাওয়া যাবে এমন কোনো মানে নেই। 'মৌক্তিকং ন গজে গজে'। আরও একটি সংস্কৃত শ্লোকের মধ্যে যা আছে, তার বাংলাটা এরকম—পশুরাজ সিংহ হাতির মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে নখের মধ্যে গজমুক্তা নিয়ে চলেছে।

ইরা দেখতে পায় সিংহের বিশাল থাবায় গজমুক্তা। গোল মুক্তোটি নখের ফাঁকে জ্বল জ্বল করে ওঠে। কিন্তু মুক্তো কি নখে নিয়ে যাওয়া যায়! ইরা ভাবে হতেও পারে। সিংহের থাবা তো। তার আবারও হাতির সেই স্বপ্নকে মনে পড়ে। অনেক অনেক হাতি। তাদের কাদা রঙের পিঠ অনেকটা দূর পর্যন্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। হাতিরা দল বেঁধে এগোয়।

এগোতে থাকে।

দূরের জঙ্গল থেকে তারা কখন যেন বেরিয়ে এসেছে। বাতাসে হাতির গন্ধ।

ঘুম থেকে কিছুটা স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ায়, খানিকটা পেটের ব্যথায় স্বপ্ন থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে ইরা আবারও গজমুক্তোর কথা ভাবে। সেই বইটিতে লেখক লিখেছেন তাঁর চল্লিশ বছরের জঙ্গুলে জীবনে আধ ইঞ্চি লম্বা শাদাটে রঙের ক্যাপসুল চেহারার একটা জিনিস তিনি পেয়েছিলেন। হাতির মাথার ভেতর থেকে নয়। দাঁতের ভেতর থেকে।

এ-বই পড়ে ইরা জানে হাতির দাঁত আগাগোড়া নিরেট নয়। নিচের, আগার দিকটা নিরেট, তবে গোড়ার দিকটা ফাঁপা। দুপাশে দাঁতের ভেতর, গোড়ার দিকে থাকে কাদা কাদা এক ধরনের জিনিস। তাকে বলে 'মাজা'। দাঁত কেটে নিয়ে তার ভেতর থেকে 'মাজা' বের করে না নিলে মাজাটুকু পচে যায়, খারাপ গন্ধ বেরতে থাকে।

স্বপ্নের হাতিরা তখনও ইরার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে।

শুঁড় তুলে তাদের সমবেত বৃংহণ ইরাকে ছুঁয়ে যায়। ইরা শিউরে ওঠে। ফাঁকা ধানমাঠ, উধাও জ্যোৎস্না, সেই দল বাঁধা হাতি—ইরা থমকে গিয়ে তার মধ্যেই তার স্বামী, হাতি তাড়ানো সুবিমলকে দেখতে পায়। জিপ, লোক-লশকর, হুলা পার্টি। সুবিমল ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছে।

সাবু সুবিমলের বাড়িতে চলে আসার আগে ঠিক করেছিল কয়েকটা কথা জানাবে সুবিমলকে। তার মধ্যে একটা হলো আমি কি সত্যি সত্যি আলেকজান্দার কার্দার আবিষ্কার করা রিয়েল লাইফ এলিফ্যাণ্ট বয়? কিন্তু সুবিমলকে সে 'বাবু' বলবে না 'স্যার' বলবে ঠিক করতে পারছিল না। শেষমেশ অনেক ভাবনা চিন্তা করে 'স্যারবাবু' কথাটা বলা যায় কিনা, আর হয়তো তা খুবই জোরদার হবে, এমন ভেবে 'স্যারবাবু' শব্দটিই বারে বারে ব্যবহার করে সাবু।

সুবিমল প্রথমটা সাবুকে ঠিক চিনতে পারে না। পরে একটা নিজের মতো আন্দাজ তৈরি করে নেয়।

ইরাও একেবারেই সিনেমার মতো নয়, একথা বলা হয়েছে আগেই। তার চোখে হাই পাওয়ারের মাইনাস চশমা। চশমা ছাড়া ইরা বলতে

গেলে একেবারে অন্ধ। তার একটা পুরনো গ্যাসট্রিক আলসারও আছে। অপারেশন করে বাদ দেয়া হয়েছে অ্যাপেনডিকস।

গ্যাসট্রিকের জন্যে ইরা একটু খিটখিটে। তার মাথার চুল বিবর্ণ, পাতলা। রোজ সকাল বিকেল তাকে নিয়ম করে একটা রেইনট্যাক খেতে হয়। নয়ত জিনট্যাক। এছাড়াও অম্বলের অন্য ওষুধও আছে। হজমের লিকুইড সিরাপ।

সুবিমল যেদিন হাতি তাড়িয়ে, হাতিরা যাতে কলকাতার দিকে আসতে না পারে, সেই ব্যবস্থা করে ফিরল, সেই ভোরে ক্লাস ফোরে পড়া সুবিমল-ইরার একমাত্র সন্তান বুচকুনের প্রশ্ন ছিল, বাবা, একটা হাতির বাচ্চা পেলে, যদি পাও—নিয়ে এসো তো।

বুচকুন হাতির বাচ্চা চেয়েছিল। হাতির দলকে পশ্চিমে ঠেলে দিতে দিতে একথা একবারের জন্যেও মনে পড়েনি সুবিমলের। আর ইরা, সে হয়ত আস্ত একটি গজদন্তের আশা করেছিল, যদি পাওয়া যায়—কিংবা তার এই যে মনের ইচ্ছে সেটিও আমরা জানি না ঠিক মতো, হয়তো সে আদৌ চায়নি হাতির দাঁত।

কাগজে কাগজে সংরক্ষণের কোটা দেখতে পাচ্ছিল সুবিমল। শতাংশের হিসেব। পার্সেন্টেজ আর ফিগার। কাঁসিরামজির হাতিই কি চলে আসছিল শহরে? সুবিমল নিজেকেই নিজে জিজ্ঞেস করেছিল।

কাগজে কাগজে এই যে এত রিজার্ভেশনের কথা। মণ্ডল কমিশন। দিল্লিতে মণ্ডলায়নের প্রতিবাদে বর্ণহিন্দু ছাত্রদের আত্মাহুতি, সারা দেশ জুড়ে বাস ট্রামে ট্রেনে আগুন, সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলন—সব মিলিয়ে সুবিমলের মাথা তালগোল পাকাচ্ছিল।

বারে বারে তার মনে পড়ছিল সাংবাদিকটির মুখ। তাকে আমি হাতি, কাঁসিরামজি, বহুজন সমাজ পার্টি—সব মিলিয়ে কি যেন একটা বলতে চেয়েছিলাম, অথচ বলতে পারিনি। বললে কি এখানেও কোনো রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়ে যেত? এমন ভাবনার ভেতর সুবিমল যেন বা সাবুকে ভুলেই যাচ্ছিল।

স্যার বা-বু-উ! সাবু ডাকল।

কোন এক গভীর থেকে উঠে এলো সুবিমল।

সামনে সাবু।

কে, কে তুমি! সুবিমল সেন তার পদ সম্বন্ধে একটু যেন সচেতন হয়ে উঠল।

স্যারবাবু!

হিন্দি সিনেমা হলে এতক্ষণে হাতি ধরা বা হাতি তাড়ানোর সময় অনায়াসে খান তিনেক গান গাওয়া হয়ে যেত সুবিমলের। আর অবশ্যই দাঁতাল গজরাজের পিঠে—যে কিনা দলকে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে এসেছে, তার পিঠে সুবিমল থাকত। হাতে শক্ত করে ধরা রাইফেল, নয় দোনলা বন্দুক। কিন্তু ছুটির দিনে সকালে অনেকগুলো খবরের কাগজ নিয়ে সুবিমল সবে বসেছে, খবরগুলো দেখবে, চা খাবে, একবার নয়, পর পর দু'কাপ, তারপর বাথরুম, দাড়ি কামানো—নিজের নিত্যকর্ম, একেবারে সাজান—ছুটির দিনেও কোনো ব্যতিক্রম হওয়ার উপায় নেই। আর সেখানে সাবু। না, না—ওকে একেবারেই মানায় না এই চিত্রনাট্যের সঙ্গে।

দেয়ালে যামিনী রায়ের প্রিন্ট, অরিজিন্যাল মধুবনি, টেবিলে ডোকরা অ্যাশপট, তাছাড়া বস্তারের অরিজিন্যাল বড় ডোকরা আছে ঘরের কোণে, বাঁকুড়ার পোড়া মাটির ঘোড়া, বাঁকুড়া থেকে আনা মনসার চালি, মেঝেতে হাহ কার্পেট। পুরুলিয়ার ছৌ-এর মুখোশ, ছৌ, না ছো—এ নিয়েও তো কত বিতর্ক, তাও দেয়ালে।

ইরা লোমঅলা কুকুর পছন্দ করে না। তাই নেই। না হলে সেটিকেও রেখে ঘর সাজানোর ষোলো কলা পূর্ণ করে দেয়া যেত।

সাবু বলছিল, স্যারবাবু—

সুবিমল কথাটা পুরো শুনতে পেল না।

তার জানতে ইচ্ছে করছিল সাবু এখানে ঢুকে পড়ল কী ভাবে? সে-ও কি কাঁসিরামজির নীল ফ্ল্যাগ থেকে হেঁটে হেঁটে নেমে আসা হাতির মতো কিছু?

হিন্দি ফিল্ম হলে সাবু নিশ্চয়ই এতক্ষণে একটা হিট গান গেয়ে ফেলত। সাধারণত এরকম রোল—মানে সাবুর বয়েস আমরা প্রথমে যা বলেছি, সেই কথা মনে রেখে বলছি, জুনিয়ার মেহমুদের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল। তার সঙ্গে কিছু লম্বা-চওড়া ডায়ালগ। ভাষণ। এমনকি গানের ব্যাক গ্রাউন্ডে হাতির ডাকও ভেসে আসতে পারত। তো সাবু এখন কী করবে?

লেখাটি যখন অন্যদিকে চলে যেতে চাইছে, তখন সাবু বলতে পারে, স্যারবাবু, আমার—আমার জন্যে নয়, পচা মাহাতদের মাথার ওপর একটা ছাউনির ব্যবস্থা করে দিন মাঠে। বেচারিদের বড্ড কষ্ট হাতি তাড়াতে। সারা রাত এই শীতে হিমের ভেতর, খোলা ময়দানে পড়ে থাকতে হয়। তার ওপর হাতির বাচ্চা হয়েছে। ডি এফ ও সাহেব বলে ফেছেন, কোনো ভাবেই হুলা পার্টি এখন হাতিদের বিরক্ত করতে পারবে না। হাতিরা খানিকটা নিশ্চিন্তে থাকবে এই ক-দিন। স্যারবাবু আপনি একটু পচা মাহাতদের কথা ভেবে—

সুবিমল সেন সাবুর কথা ঠিক ঠিক ধরতে পারছিল না। হুলা পার্টির পচা মাহাত কে? তাদের জন্য তো অন্য ডি এম। হাতি তো এখন গিলবানির জঙ্গলে। সেটা তো জেলা মেদিনীপুর, রোজই তো খবরের কাগজে পড়ছি এসব। সুবিমল বড় আতান্তরে পড়ে গেল।

তোমার নাম কি? সুবিমল এতক্ষণ পর সাবুর নাম জানতে চাইল।

উত্তরে সাবু দাঁত বের করে হাসল। তার বুকের 'র‍্যামবো' লেখা জামায় এখনও মেদিনীপুরের ধুলো। দাঁত বার করতে করতে সাবুর মনে পড়ল খোলা মাঠে শুয়ে আছে পচা মাহাতরা। তারার আলোর নিচে!

সাবু কোনো উত্তর দিল না। উল্টে সে সুবিমলকেও সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করল, যেমনটি প্রথমবার সেই বাঁশ বাগানের কাছে, দাঁতালকে—হেই গো, গণেশবাবা—আমার মায়ের বাতের ব্যথা সারিয়ে দাও গো। আর আমাদের গোরুটা যেন এবার বকনা বাছুর দেয় গো—হেই গো গণেশবাবা, সেরকমই কিছু একটা বিড় বিড় করতে করতে সে

সুবিমলেরও পায়ের কাছে শুয়ে পড়ল। এবার তার চাহিদা বকনা বাছুর কিংবা মায়ের বাতের ব্যথা সারিয়ে দেয়া নয়। বরং পচা মাহাতদের মাথার ওপর ত্রিপল। খানিকটা ছাউনি। হিমে ওদের বড্ড কষ্ট।

সুবিমল কী উত্তর দেবে কিছু বুঝে উঠতে পারছিল না। আর আমরাও সাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে স্ক্রিপটটা রিপেয়ার করতে পারলাম না। হায় কপাল।

ঠিক তখনই দর্ভপাণি রায় তার সল্টলেকের বাড়িতে পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্যের 'হাতির সঙ্গে পঞ্চাশ বছর' পড়ছিল। সকাল হয়েছে একটু আগে। দর্ভপাণি চা খেয়েছে একবার। বইয়ের পাতা দর্ভপাণিকে বলে যাচ্ছিল—

আল্লাহ আল্লাহ বলরে ভাই, হায় আল্লাহ রসুল, কোন মহালের হাতি রে ভাই, হায় আল্লাহ রসুল?

…মহালের হাতি রে ভাই হায় আল্লাহ রসুল।

কোন ফান্দির ধরা রে ভাই, হায় আল্লাহ রসুল?

…ফান্দির ধরারে ভাই হায় আল্লাহ রসুল।

কোন মাহুতের দোহার রে ভাই হায় আল্লাহ রসুল?

…মাহুতের দোহার রে ভাই হায় আল্লাহ রসুল।

দর্ভপাণি পাতা উল্টে উল্টে যাচ্ছিল আর যেতে আবারও থেমে গিয়ে সে গানের লাইন খুঁজে পেল।

হস্তীর কন্যা, হস্তীর কন্যা বামুনের নারী, মাথায় নিয়া তামাকলসি, ও সখি সোনার হস্তে ঝারি।

সখি ও-ও মোর হয় হস্তীর কন্যা রে—

খানিকো দয়া নাই মাহুতের লাগিয়া রে

পাত্তিয়া করিয়া কন্যা বাড়িয়া দিলেন পাঁও

মাথার ওপর কাল-জিটি ও সখি করে পঞ্চরাও
বালুটিলটিল পঙ্খী কান্দে, বালুতে পড়িয়া
গৌরীপুরিয়া মাহুত কান্দে, ও সখি ঘরবাড়ি ছাড়িয়া।
আই ছাড়িলং, ভাই ছাড়িলং, ছাড়িলং সোনার পুরী।
বিয়াও করিয়া ছাড়িয়া আসিলং ও সখি অল্প বয়সের নারী।

দর্ভপাণি পড়তে পড়তে সেই মাহুত-বৌয়ের বিরহের গানটিও পেয়ে যায়।

(ও কিং ও) ও মোর দান্তাল হাতির মাহুত রে
যেদিন মাহুত শিকার যায়, নারীর মন ঝুরিয়া রয় রে!
(ও কি ও) ও মোর সারিন হাতির মাহুত রে,
যেদিন মাহুত উজানে যায়, নারীর মন পুড়িয়া রয় রে।
আকাশেতে নাই রে চন্দ্র কী করে তোর তারা,
যেবা নারীর সোয়ামি নাই রে, ও তার দিনে আন্ধিহারা।
পুষ্করিণীতে নাইরে পানি, নৌকা ক্যামনে চলে, যেবা নারীর পুরুষ নাইরে, ও তার রূপে কি কাম করে।
(ও কি ও) ও মোর মাখনা হাতির মাহুত রে,
যেদিন মাহুত আসাম যায়, নারীর মন জ্বলিয়া রয় রে।
(ও কি ও) ও মোর টুই হাতির মাহুত রে,
যেদিন মাহুত জঙ্গল যায়, নারীর মন মোর কান্দিয়া রয় রে।
যেদিন মাহুত জঙ্গল যায়, নারীর মন মোর কান্দিয়া রয় রে।
...আজি আউলাইলেন মোর বান্দা ময়াল রে।
হাতির পিটত থাকিয়া রে মাহুত কিসের বাটুল মারো
ওরে পরের ঐ কামিনীকে দেখিয়া জ্বলিয়া ক্যানে মরোরে।
হাতির পিটিত থাকিয়া রে মাহুত থোড় কলা ভাঙো।
নারীর মনের কথা তোমরা কিবা জানো।
রাস্তা ছাড়ো রাস্তা ছাড়ো জলের কলস কাখে।
মিচা মায়া নাগেয়া রে মাহুত পাগল কইরলেন মোকে রে।

হাতির পিটিত থাকো রে মাহুত হাতির মায়া জানো।
নারীরো বেদনা রে মাহুত কিবা তোমরা জানো রে।
বৈদ্যাশিয়া মাহুত তোমরা রে।
তোমার কিসের মায়া নারীর মন ভাঙ্গিয়া রে
মাহুত যাইবেন ছাড়িয়া রে—

সারাদিনের খাটুনির পর অসমের গৌরীপুরের মাহুত-ফান্দিদের গলায় এই সুর—দর্ভপাণি পাতা উল্টোতে উল্টোতে নিজেকে গুছিয়ে নিল। আর তখনই তার সেই হস্তিকন্যার কিংবদন্তীটি মনে পড়ে।

নদীর নাম 'দ্যাওয়া-মিয়া' অর্থাৎ 'দেবী মায়াময়ী'।

ভুটান পাহাড়ের কোলে ঐ নদীর ধারে ছোট এক কুঁড়েঘর। সেই ঘরের ভেতর থাকে দুজন। ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী।

যজমানী করে ব্রাহ্মণ। এবাড়ি ওবাড়ি পুজোপাঠ। আর পৈতের সুতো কাটে ব্রাহ্মণী। আশপাশের গাঁয়ে যত ব্রাহ্মণ আছে, তারাই কিনে নেয় তার সুতো।

এইটুকু মনে পড়ার পর দর্ভপাণি রায় পাশের টেবিলে রাখা পাইপে ক্লাইংডাচম্যান টোব্যাকো ঠেসে নেয়। তারপর তামাকের সুরভি, ভারি ধোঁয়া ঘরের বাতাসে মিশিয়ে দিতে দিতে তার মন কেন যেন খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে ষাটের দশকে মুর্শিদাবাদে চলে যেতে চায়। ফরাক্কা বাঁধের কাজ সবে চালু হয়েছে। তখন চন্দ্রা আমার কাছেই, সবে এক খানা রেকর্ড বেরিয়েছে ওর। আর গঙ্গার ধারে বড় লিচু বাগানে লিচু ছিঁড়তে-ছিঁড়তে সেই কে এক জন যেন অপর জনকে জিজ্ঞেস করেছিল, বাইল্যা মাছ কত বড় ছাখছেন?

তখন দর্ভপাণি মুর্শিদাবাদের কয়েকটা লিচু বাগান, আম বাগান ঘুরে দেখার তাগিদ নিয়ে মুর্শিদাবাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর সেবারই তার প্রথম জেনে যাওয়া, কাছাকাছি মৌমাছি ওড়াউড়ি, ঘোরাঘুরি, যাওয়া-আসা না করলে ভালো আমের ফলন হয় না। মৌমাছিরা

মুকুল ভালো হয়ে ওঠার জন্যে সব সময় সাহায্য করে।

যাকে জিজ্ঞেস করা হলো, সেই লোকটি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে, গুন গুন করে কী একটা গানের সুর নিজের মনে ভেঁজে নিতে নিতে বলেছিল, দেখছি দেখছি। হ, বড়ই দেখছি। চার পাঁচ স্যারের তো হইবই। এক পাসারি, পুরা—

যে লোকটি বেলে মাছ কত বড় দেখা আছে জানতে চাইছিল, তার অনেক বড় বড় মাছ দেখা আছে। নদী থেকে জালে ওঠা কুড়ি-পঁচিশ কিলো বোয়াল। খুব বড় শিলং মাছ। তিরিশ-পঁয়ত্রিশ কে. জি-র কাতলা। দেড়-দু কুইন্টালের 'বাঘের' নামের মাছ। কিন্তু পাঁচ সের ওজনের বেলে! সে তো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। বেলে তো হয় বড় জোর পাঁচশো ছশো গ্রাম!

দর্ভপাণি অবাক হয়ে গুন গুন সুর ভাঁজা লোকটির দিকে তাকিয়েছিল। আর তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজের হাতে গাছ থেকে লিচু ছেঁড়া ভুলে গেছিল।

পাঁচ কিলো—এক পাসারি বেলে মাছ, সে কত বড়? লোকটি কি কল্পনায় ছিল? এই কল্পনায় কি এক ধরনের মুক্তি আছে?

শীতের সেই সকাল দশটা এগারোটা হবে, দূরের গঙ্গার গেরুয়া জলস্রোত—তখনও বাংলাদেশ হয়নি, পূর্ব পাকিস্তানই, দর্ভপাণি দেখতে পাচ্ছিল। আর তারপরই আবারও সেই ব্রাহ্মণের গল্প ফিরে আসে দর্ভপাণি, যেখানে ব্রাহ্মণীর কাটা সব সুতো আশেপাশের যে গ্রাম, তার থেকে এসে অন্য ব্রাহ্মণেরা কিনে নিয়ে যায়। দুজনের রোজগারে দিন বেশ ভালোই কাটে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর।

নিজেদের যা বাড়তি খাবার-দাবার তারা ছড়িয়ে দিত নদীর ধারে। বনের পাখি আর পশুদের জন্যে। আর তার বদলে পাখিরা তাদের এনে দিত মধুমাখা ফল। পশুরা শাক-পাতা, ফল-মূল। বেশ সুখে-শান্তিতে কাটছিল তাদের দিন।

কিন্তু জীবনের এত সুখ যদি বা কপালে সয়, এমন গল্পের সুখ কপালে সয় কি?

ব্রাহ্মণ গেল আর এক বড়লোক ব্রাহ্মণের শেষ কাজ করতে। আর সেই যাওয়াই যাকে বলে হলো কাল।

সেই যে ব্রাহ্মণ মারা গেছে, তার ছিল অনেক টাকা। আর একটি মাত্র মেয়ে।

মারা যাওয়া ব্রাহ্মণের বিধবা ব্রাহ্মণীই শেষ কাজ করাতে আসা ব্রাহ্মণকে ধরে বসল, বাবা, আমাকে তুমি উদ্ধার করো কন্যাদায় থেকে। আর এই সব টাকা-পয়সা, জমি-বাড়ি—সব তোমাদের। তোমরা দুজনে মিলে ভোগ করো।

ব্রাহ্মণের সেই মেয়েটি দেখতে খুব কুচ্ছিত। তার স্বভাব আরও খারাপ। কিন্তু হলে হবে কি! টাকার লোভ বড় লোভ। তাই প্রথম প্রথম একটু 'না না' করলেও শেষ অব্দি রাজি হয়ে গেল ব্রাহ্মণ।

বিয়ে হলো। নতুন বউ নিয়ে বাড়ি এলো ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণী সব দেখল। দেখে বুঝল তার কপাল পুড়েছে। দেখতে দেখতে কুঁড়েঘর সরে গিয়ে মাথা তুলল তিন মহলা বাড়ি। নতুন শ্বশুরের টাকায় একরাশ ঝি-চাকর। বাড়ি একেবারে জমজমাট যাকে বলে।

ব্রাহ্মণের সেই যে পুরনো ব্রাহ্মণী তার দিন কাটে চোখের জল ফেলে। কাজ এখন তার একটাই, নদী থেকে সোনার ঝারি করে জল আনা। এই জল বয়ে আনার ফাঁকে ফাঁকে কখনও কখনও তার চোখোচোখি হয় স্বামীর সঙ্গে। আর এইটুকুর লোভেই তার জল তুলতে আসা।

কাজের মজুরি হিসেবে সারাদিনের শেষে এক থালা আকাঁড়া চালের ভাত বরাদ্দ তার জন্যে। কিন্তু সেই যে আমাদের গল্পের ব্রাহ্মণী, যে কিনা পৈতের সুতো কেটে দিন কাটাত, সে সেই সতীনের দেয়া ভাত মুখে তুলত না। বনের ফলমূল খেয়ে কাটিয়ে দিত দিন।

এক হাতে সোনার ঝারি, অন্য হাতে ভাতের থালা। মাথায়

তামার কলসি। বন পেরিয়ে যাচ্ছে ব্রাহ্মণী নদীর ধারে

তারপর, দর্ভপাণি মনে করতে চাইছিল—তারপর ?

তক্ষণে সাবু এসে গেছে দর্ভপাণির সল্টলেকের বাড়িতে। হস্তিবিশারদ দর্ভপাণি এখন একাই থাকে। খালি একজন রান্নার ঠাকুর ছাড়া, বাড়িতে আর কোনো মানুষ নেই।

সাবু সেই বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ে। সামনে বাগান, সুন্দর গেট, কেমন যেন বিহ্বল হয়ে যায় সাবু।

'স্যারবাবু'—এখানেও তো তাই বলতে হবে, সাবু ঠিক করে ফেলে, যেমনটি সুবিমলের বাড়িতে, তেমনি এখানেও।

দর্ভপাণি তখনও কিংবদন্তীর মজায়।

নদীর ধারে চলে আসত ব্রাহ্মণী।

আসতে আসতে পথেই বিলিয়ে দিত তার সতীনের দেয়া খাবার। বনের পশুপাখি সেই খাবার খেয়ে নিত। তারপর নদীর ধারে বসে বসে সে তোলপাড় করা দুঃখের কথা বলত মনে মনে। তখন সে কথা বলত শুধু নদীরই সঙ্গে। নদীকে ডেকে ডেকে বলত, ও নদী, আমার বড় দুঃখ।

নদী কথা বলে না।

আমার বড়ই কষ্ট নদী। বড্ড কষ্ট।

নদী কোনো কথা বলে না, শুধু বয়ে যায়।

দুখিনী ব্রাহ্মণীর চোখের জল মিশে যেত নদীর জলে। ফোঁটায় ফোঁটায় নামা জল। আহারে, সে কত ফোঁটা! চোখের জলে বুক ভাসে। নদী ভেসে যায়।

তারপর সে এক কাহিনী। সেই কাহিনী মিশল এ-কাহিনীর সঙ্গে।

হাতিদের রাজা প্রায়ই আসে জল খেতে নদীতে। হাতিরাজের সঙ্গে আরও হাতি। অনেক হাতি।

দলবল নিয়ে জল খেতে নদীতে নামে হাতিরাজ। জল নিয়ে খেলে। মাতামাতি। জল ছোড়াছুড়ি। শুঁড়ে করে জল তুলে পাঠায় আকাশের দিকে। তারপর সেই জল সহস্রধারায় পৃথিবীর দিকে—নেমে আসে যেন-বা আলোর ঝরনা।

উজান থেকে নদীর ভাটিতে গিয়ে হাজির গজরাজ। সেখানকার জল রাজার মুখে কেমন যেন বিস্বাদ ঠেকল। নোনা।

কী ব্যাপার! রাজা খোঁজ নেয়। সঙ্গের অন্য হাতিরা বুঝিয়ে বলে, মহারাজ, নদীর ঘাটে বড় সুন্দরী এক নারী রোজ চোখের জল ফেলে। তার কান্নাতেই নদীর জল হয় নোনা। কান্না যদি নদীতে মেশে, তাহলে ভাটির দিকে জল তো নোনতা হবেই।

এইটুকু শোনার পর একদিন হাতিরাজ সোজাসুজি মেয়েটির সামনে এসে হাজির।

ব্রাহ্মণী দেখে তার সামনে পাহাড় যেন এমন হাতি। তখন ব্রাহ্মণীর মাথায় কলসি, হাতে সোনার ঝারি।

ব্রাহ্মণী এখন সামনে যাবে কীভাবে! পথ আটকে হাতিদের রাজা।

এবার ব্রাহ্মণীর আবারও কান্না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। ফুলে ফুলে। কেঁদে কেঁদে শুধুই বলে যাওয়া তার দুঃখের কথা।

হাতি বলল, দেখলে তো—কোনো দয়ামায়া নেই মানুষের সমাজে। তার থেকে তুমি আমাদের হও। চলে এসো আমাদের দেশে। আমরা তোমায় রানী করে রাখব।

এপর্যন্ত ভেবে নিয়ে নিভে আসা পাইপে নতুন করে ফ্লাইংডাচম্যান ঠেসে দিল দর্পপাণি। তামাক ফুরিয়ে এলে জিভটা তেতো লাগে। তারপর বলল, সুশীল, আর এক কাপ চা।

সুশীল চা দিয়ে গেলে দর্পপাণি আবারও জুত করে বসবে। কিন্তু সাবু ততক্ষণে ঢুকে পড়েছে গল্পের ভেতর। সে যেন গল্পের শেষটুকু জানে, এভাবে বলে যাচ্ছিল—

ব্রাহ্মণী প্রথমটা দোনামোনা করেছিল। মনে সন্দেহ আর

কি! হোক না রাজ—সে রাজা তো হাতিদের, তাকে কি পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায়!

সাবুর গলা শুনে কপালে পরিষ্কার তিনটে ভাঁজ পড়ল দর্পপাণির। গালে চামড়া জড়ানো হনুরেখার সূক্ষ্মলাইন স্পষ্ট হলো।

কে রে তুই?

আমি সাবু।

হরি হে, পায়রা ওড়াও। কে সাবু!

আজ্ঞে স্যারবাবু, সেই যে হাতি খেদাবার সময় আপনি বাঁশবাগানের ভেতর পড়ে গেছিলেন। আমি আপনাকে ধরে ধরে তুললাম। বলতে বলতে সাবু খানিকটা দূরে দাঁড়িয়েছিল।

তুললি! আমায়! আমি পড়ে গেছিলাম? দর্পপাণির ইগোতে লাগছিল। আমি দর্পপাণি রায়, বিখ্যাত হস্তিবিশেষজ্ঞ, আমি হাতি খেদায় গিয়ে পড়ে যাব! এতো, মানে ভাবা যায় না। আর পাবলিক, মিডিয়া যদি জানতে পারে। দর্পপাণি এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল।

সাবু তেমনই স্থির দাঁড়িয়ে। তার খালি পা। সেই পা দুটোতে হাঁটু পর্যন্ত ধুলো, হাফ প্যান্ট তেমনই আছে—ময়লা। আর গায়ে পুরোহাতা ধুলোমাখা 'র‍্যামবো' লেখা গেঞ্জি।

সেই জ্যোৎস্নায়, শেষ রাতের শীতে অন্ধকারে বাঁশবাগানের ভেতর সত্যি সত্যি কি আমি পড়ে গেছিলাম! না এ কোনো বিভ্রম? হয়তো আদৌ এরকম কিছুই হয়নি—দর্পপাণি মনে মনে হিসেব করছিল।

আমি আপনাকে তুললাম স্যারবাবু। বিশ্বাস করুন। মা কালির দিব্যি। মায়ের দিব্যি। গণেশবাবার দিব্যি।

থাক। থাক। সকালে আর এত দিব্যি টিব্যি গালতে হবে না। তা তুমি আমায় তুলেছিলে সত্যি—নাকি—বলতে বলতে দর্পপাণি তার ডান হাঁটুতে সেই বাঁশবাগানে আছাড় খাওয়া ব্যথা টের পেল। আর সাবুর কথা মেনে নিয়ে, তখন তো এত লোকজন, মশালের আলো, ধোঁয়া, শব্দ, হই হই চিৎকার, তখন কে পড়ল, কে কাকে

তুলল, তবু এই বাচ্চা ছেলেটা—কিন্তু সেই হাতি তাড়ানোর সময় ও ঢুকে পড়ল কেমন করে, কীভাবে এখন এই গল্পের মধ্যে ঢুকে পড়ে, যখন কী না এ-কাহিনীর অতীব ক্রুসিয়াল মোমেন্ট—ব্রাহ্মণী হাতি হয় না মানুষ থাকে—তখন সাবু—কোত্থেকে বাবা—

সাবু কিন্তু বলতে থাকে—

ব্রাহ্মণী তো দোনামোনা করছে। আর সখনই বন্যা নামল দু-কূল ছাপিয়ে। নদীর জল উঠল ফুলে। কী তার গর্জন। ফেনা আর ঢেউ।

ছেলেটা তো জানে ঠিক ঠিক সব। দর্ভপাণি অবাক হলো।

নদীর জল ছুটে আসছে হা-হা শব্দে—বলে যাচ্ছে সাবু।

স্রোতের মুখে পড়ল ব্রাহ্মণীর কুঁড়ে। কুটো হয়ে গেল। তারপর সেই ব্রাহ্মণ আর অহঙ্কারী নতুন বৌয়ের তিন মহলা বাড়ি, সেও গেল উড়ে। চোখের নিমেষে হাতিদের রাজা পিঠে তুলে নিল বামুনবৌকে। ব্রাহ্মণী তো ভয়ে কাঠ হয়ে আছে তখনও। হাতির পিঠে উঠেও তার কাঁপুনি থামে না।

এবার তো হাতির রাজা সমস্ত রাস্তা আলো করতে করতে পিঠে ব্রাহ্মণী বসিয়ে ছুট ছুট ছুট।

সব ঠিক ঠিক বলে যাচ্ছে সাবু। এ-গল্প ও জানল কোথায়? ভাবতে ভাবতে পাইপে একটা জোরে টান দিল দর্ভপাণি। পোড়া তামাকের ধোঁয়া ঘুলিয়ে দিল ঘরের হাওয়া।

সাবু কিন্তু থামেনি। এ-গল্প তার সবটাই মুখস্থ।

সে তো দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে সেই পাহাড় যেন হাতিটি পিঠে বসান বামুন বৌ-কে নিয়ে দৌড়চ্ছে। দৌড়চ্ছে। দৌড়চ্ছে।

তো স্যারবাবু বুঝলেন—সাত সাতটা দিন আর ন নটা রাত। হ্যাঁ গো—সাত দিন, ন রাত। হাতির রাজা বামুন বৌকে নিয়ে পৌছল ভুটান পাহাড়ে। সেই পাহাড়ের কোলে হাতিদের রাজত্ব। হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি বিরাট রাজপ্রাসাদ। রাজসিংহাসন, রাজসভা—তাও তৈরি হাতির দাঁতে।

হাতিরাজ বামুন-বৌ-কে বসাল সেই হাতির দাঁতের শাদা

সিংহাসনে।

চেয়ারে বসা দর্ভপাণি উসখুস করছিল—এত জানলে কী করে বল তো ছোকরা?

ততক্ষণে সুশীল দামি ক্রকারিজে লিমন টি নিয়ে এসেছে।

তুমি চা খাবে?

সাবু ঘাড় নাড়ল—খাবে না—মুখে তার গল্প ছাড়া কোনো কথা নেই।

হাতিরাজা সেই শাদা সিংহাসনে বসিয়ে দিল বামুন-বৌকে। অমনি দশদিক আলো হয়ে উঠল। বামুন-বৌ লজ্জায় মুখ নামাল।

লজ্জায়, নাকি বাঁচার আগ্রহে মাথা নিচু করল! দর্ভপাণি নিজেকেই নিজে জিজ্ঞেস করল।

গল্প শোনার ফাঁকে গরম চায়ে চুমুক দিয়েই চমকে উঠল দর্ভপাণি। জানা কাহিনী, কিন্তু ছেলেটা যে এত ভালো বলতে পারে, তাতো আগে বুঝিনি। হাত দিয়ে কপালে নেমে আসা কাঁচাপাকা চুল পেছন দিকে সরিয়ে দিয়ে দর্ভপাণি তাকাল সাবুর মুখের দিকে।

যেই সিংহাসনে বসল বামুন-বৌ, অমনি 'জয় জয়' দিয়ে উঠল সব হাতিরা। সে এক কাণ্ড বটে।

বামুন-বৌ হলো হাতির রানী। তার চোখ আরও নেমে গেল মাটির দিকে।

কিন্তু রানীর যে অভিষেক হবে, সেই জল কই! কোথায় জল!

কী ভেবে রাজা হাতি নতুন রানী হওয়া বামুন-বৌ-কে মাথায় বসিয়ে নিয়ে ছুটল।

এবারের রাস্তাও বড় সুন্দর—সাবু বলে যাচ্ছে।—বড় মনোরম।

দর্ভপাণি দেখতে পাচ্ছে হুগলির নারায়ণপুরে হাতি ঢুকে এসেছে। দলমার পাহাড় থেকে নেমে আসা বুনো হাতি। সেই হাতিরা তাড়া খেয়ে, পোড়া কাঠের ছ্যাঁকা গায়ে নিয়ে জলে নেমেছে, পুকুরে। পাশেই একতলা, দোতলা বাড়ি। বাড়ির গায়ে বড় পুকুর। হাতিরা জলে নেমে আর উঠতে চায় না। জল ছুড়ে দেয় শুঁড়ে করে।

পাশাপাশি বারো চোদ্দটা হাতি। গায়ে গা লাগান। জলের ভেতরও জেগে আছে তাদের মেঘ রঙের পিঠ। পাঁচ পাবলিক একটু দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে।

সাবু তাকিয়েছিল খানিকটা অন্যমনস্ক দর্ভপাণির দিকে।

তারপর বলতে থাকে, হাতিরাজা তো দৌড়য়। দৌড়য়। মাথার ওপর বামুন-বৌ। দুপাশে খাড়া পাহাড়। মাঝে সুন্দর রাস্তা। ছুটতে ছুটতে সেই পথ ফুরিয়ে গেলে সুন্দর একটা ঝরনা।

হাতির রাজা দাঁড়াল ঝরনার পাড়ে। সাত রঙের জল উঠে আসে ঝরনা থেকে সাতটা ধারায়। এবার একে একে সাত সাতটি ধারা থেকে সাত ঘটি জল ভর্তি করল হস্তিরাজ। তারপর সেই ঘটভরা জল ঢেলে দিল বামুন-বৌয়ের মাথায়। ব্যস, একটু পরেই যেন বা মন্ত্রবলে বদলে গেল বামুন-বৌয়ের চেহারা।

ব্রাহ্মণী, সেই সিংহাসনে বসা রানী হয়ে গেল মেয়ে-হাতি। মাথায় তার যে তামার কলসি ছিল তা একটুখানি রয়ে গেল কপালের গড়নে। আর সোনার ঝারিটি হলো শুঁড়।

তখন হাতিরাজা বলল, শোনো রানী, এখন থেকে আমরা তোমারই হুকুম মেনে চলব। তুমি যা বলবে, তাই হবে।

হাতিরা আবার সবাই মিলে শুঁড় তুলে 'জয় জয়' দিল। তারা সবাই সাপোর্ট করল রাজাকে।

সঙ্গে সঙ্গে রানীর হাতে চলে গেল হাতির দলের চলা। ফেরার দায়িত্ব। তারপর নতুন রানীই হাতির সেই বিরাট দলকে পথ দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে গেল হাতির দেশে।

গল্প শেষ করে লাজুক লাজুক মুখে দাঁড়িয়ে ছিল সাবু।

দর্ভপাণি পাইপে এবারও নতুন করে তামাক ভরছিল। সাবু মাথা নিচু করে বলছিল, গিলবানির জঙ্গলে যে হাতিরা ঢুকেছে, তাদের একটা বাচ্চা হয়েছে।

সে তো জানি। দর্ভপাণি ঘাড় নাড়ল—কাগজে বেরিয়েছে তো। সেখানে হুল্লা পাটি বসে আছে। যতক্ষণ না হাতি নড়বে ওরাও

নড়বে না।

জানি। জানি।

হুলা পাটির লিডার পচা মাহাত।

সেও জানি।

এবার সাবু চুপ করল।

কী হলো, তারপর বলো।

পচাদাদের শোয়ার জন্যে রাত্রে ত্রিপল নেই। মাথায় ছাউনি না থাকলে হিম লাগে। বাচ্চা আছে। তাই হাতিও জিরোবে।

তার আমি কী করব—এমনটি দর্ভপাণি মুখে বলল না। চুপ করে রইল। তারপর সাবুর দিকে তাকিয়ে একটা লম্বা শ্বাস ছাড়ল।

৬। দাঁতালের স্বপ্ন

ষোল নখী ঝাড়ুদম

যে চড়হে, ক'গয়ী সহদেব নকুল

ঘর জ্বলে, ঘরণী মরে স্বামী চলে বিদেশ

গিলবানির জঙ্গলে অন্ধকারে, সেই দাঁতালটি যেন স্বপ্নে ছিল। আর তার শৈশবে—শৈশবে কি, নাকি বালকবেলায়, শোনা এই কহাবতটি, দাঁতালের মনে পড়ছিল—শোনপুরের মেলা থেকে কিনে আনার সময় চিলকিগড়ের বড় রাজকুমার এই কহাবতটি বলে আমার কত কি খুঁটিয়ে দেখলেন।

চার পায়ের নখ আঠারোটা হতে হবে। তার থেকে কম হলে অপয়া। সামনের পায়ে পাঁচটা করে। পেছনের পায়ে চারটে চারটে আটটা। বেশি হলে অবশ্য ক্ষতি নেই, এসব মানুষদের হিসেব।

তারপর ল্যাজটা যদি গোড়ালির নিচে যায় আর মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে তাহলে সে হাতির ঝাড়ুদুম। বাজারে অচল। সে নাকি বাইরের যত অলক্ষ্মী, অকল্যাণ ঝেঁটিয়ে নিয়ে আসে ঘরে।

বড় রাজা খুব মন দিয়ে দেখছিল এই সব। আমার পায়ের তালু কালো কিনা—ডাইনের দাঁত নিচে বাঁ দিকের দাঁত ওপরে তোলা যাতে না হয়, সেদিকেও তার ছিল কড়া নজর। তারপর চোখ দেখা। চোখের কাছে আগুন নিয়ে গিয়ে দেখা, আমি ঝপ করে চোখ বুজে ফেলি কিনা। আর দেখা পিঠের গড়ন। চওড়া চৌরস পিঠ। যাকে বলে সম্বল পিঠ। পিঠ ঢেউ খেলান হলে মাল বইতে অসুবিধে। পিঠে ঘা হতে পারে। আর ঘা যদি একবার হয়, তো তা আর সারতে চায় না। সেই ক্ষতকে কেউ বলে কাড়ি, কেউ বলে ফাকুই।

বড় রাজকুমার হাতি চিনতেন। গ্যাঁড়াখাল মানে যে হাতির চামড়া গণ্ডারের মতো গুটলি গুটলি, সে হাতির তাগদ বেশি। সহজে কাহিল হবে না। পিঠে ঘা হবে না। তাহলে; 'সম্বল পিঠ, পক্ষী ডুম আর গ্যাঁড়াখাল'—এমন হাতিরাই সবার সেরা। 'পক্ষীডুম' মানে হলো যে হাতির ল্যাজ পাখির ল্যাজের মতোই ছোট, মাটি থেকে সাত বা আট ইঞ্চি, কি তারও ওপরে থাকবে ল্যাজ। তবে না সুলক্ষণ!

গিলবানির জঙ্গলে বয়ে যাচ্ছে শীতের বাতাস। নতুন-মা হওয়া হাতিটি আগলে রেখেছে বাচ্চাকে। দাঁতাল ঠিক ঘুমে নয়, আধো তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্নে দেখতে পাচ্ছিল। চিলকিগড়ের সেই রাজবাড়ি। অষ্টভূজা দুর্গামূর্তি। পিলখানা। হাতির সাজ। হাতির পায়ে শেকল। শেকল। দাঁতাল যেন বা ঝন্ ঝন্-ন শুনতে পায়। আর তারও কত বছর আগে সাইবেরিয়ার লেনা নদীর তীরে—স্বপ্নের ভেতর আর একটা স্বপ্ন ঢুকে পড়ে নতুন এক ঘোর বোনা হতে থাকে—হু-হু তুষার ঝড়ের ভেতর সেই বরফ-ভূমি। মাথার ওপর ধূসর আকাশ। লোমশ ম্যামথেরা চলেছে। আমি তো সে দলেও আছি।

দাঁতাল দেখতে পেল তার গায়ে বড় বড় লোম। বিশাল বাঁকানো দাঁত। গ্রীষ্মে আর্কটিক সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ে বরফ সরে গেলে সেই যে ম্যামথদের দাঁত বেরিয়ে আসে, লোমশ মাংস, যা খুঁজে খুঁজে বার করে বরফে হাঁটা কুকুরেরা—সাইবেরিয়ার ধূসর বরফমাখা

আলো-আঁধারির ভেতর বরফের নিচে সেই আমিই হয়তো, জমাট বেঁধে, যার খানিকটা কেটে নিয়ে গেছে তুষার যুগের কোনো শিকারী। আর আমার পেটের ভেতর তখনও গজ গজ করছে বেঁটে উইলোর পাতা, যা এখনও পাওয়া যায় তুন্দ্রা অঞ্চলে।

আমার—এই ম্যামথের দাঁতের ওপরই ছাব্বিশ হাজার বছর আগে একজন প্রাচীন মানুষ, তারই মতো কোনো মানুষের ছবি খোদাই করেছিল।

পাশ দিয়ে বয়ে যায় লেনা নদী। কে ছিল সেই মানুষটি—সে কি ঐ খোকাটি, যে আমায় রাতের অন্ধকারে দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন করেছিল—তোমরা কি রাজবাড়ির?

আমরা কি রাজবাড়ির? আমরা কি সাইবেরিয়ার, আমরা কি আফ্রিকার? আমরা কি দলমার? আসলে আমরা কি চির-যাযাবর? আফ্রিকা থেকে কবে, সেই যিশুর জন্মের দুশো পঞ্চাশ লক্ষ বছর থেকে শুরু করে দশ হাজার বছর আগেও আমরা ছড়িয়ে পড়েছি—এখানে ওখানে, সেখানে। এমন কি ক'বছর আগেও হাজার দুই আফ্রিকার হাতি তাদের চিরাচরিত বাসভূমি ছেড়ে, সম্পূর্ণ নতুন জায়গায়।

দাঁতাল তখনও স্বপ্নে ছিল।

তার সামনে দিয়ে হিমেল হাওয়া পেরিয়ে, বরফ মাড়িয়ে হেঁটে যাচ্ছে লোমঅলা বিশাল বিশাল ম্যামথ। আর তখনই সেইসব তুন্দ্রা, ম্যামথ মুছে গিয়ে তার চোখের ভেতর জেগে উঠল শোনপুরের হরিহরছত্রের মেলা। আমি কি সেখান থেকে রাজবাড়ি—চিলকিগড়ের বড় রাজকুমারের সঙ্গে এসেছিলাম?

রাসপূর্ণিমার সময় মেলা। আকাশে জেগে থাকা পূর্ণ চাঁদ। বাবা হরিহরনাথের মন্দির কাছেই। আর এ-মন্দির নিয়ে যে গল্প সে-ও এক হাতিকে নিয়ে।

সেই কবে—অনেক অনেক বছর আগে লড়াই লেগেছিল হাতি আর কুমিরে।

দাঁতাল মনে করতে চাইল। কুমিরের কামড়ে কামড়ে আমার

'গায়ের ছাল-চামড়া উঠে, রক্তে-মাংসেসেএক বিপদের জায়গায়, হয়তো মরেই যাব—দাঁতাল নিজেকে কুমিরের সঙ্গে যুদ্ধে দেখতে পেল।

কী লড়াই। কী লড়াই! বাপ রে বাপ—তখন এগিয়ে এলেন ভগবান বিষ্ণু।

ভগবান বিষ্ণুর মুখ কেমন? দাঁতাল চিলকিগড়ের বড় রাজকুমারকেই দেখতে পেল। হ্যাঁ, বড়রাজকুমারই তো—তিনিই এসে আমায় বাঁচালেন। নাকি ঐ সেই ছেলেটা—সে আমায় জিজ্ঞেস করেছিল, তোমরা কি রাজার হাতি?

জঙ্গলের মাথার ওপর চাঁদ উঠে এলে শাল-মহুয়ার ফাঁকে ফাঁকে অন্য এক মায়া তৈরি হয়। সেই বনজ্যোৎস্নায় দাঁতাল কবেকার সেই বরফ জমে থাকা সাইবেরিয়া, লেনা নদী, হরিহরছত্রের মেলা, বিষ্ণু-ভগবান হয়ে চলে আসা চিলকিগড়ের বড় রাজকুমার—সব একাকার করে ফেলছিল।

শীতের হাওয়ায় শব্দ ওঠে গাছের পাতায়। মনে হয় কেউ, নাকি কারা বুঝি দল বেঁধে হেঁটে আসছে।

দাঁতাল ঝিমটি ভেঙে জেগে ওঠে। দূরে দূরে হাতিরা সবাই দাঁড়িয়ে তাদের দলে নবজাতকটিকে ঘিরে। কোথাও কোনো শব্দ আর পা॰য়া যায় কিনা, তার জন্যে দাঁতাল কান খাড়া করে থাকে। তারপর কিছু না পেয়ে আবারও স্বপ্নে সে সীতা-রামজির পশুমেলায় চলে যেতে পারে।

রাসপূর্ণিমার পরের শুক্লাপঞ্চমীতে মেলা। আকাশে চাঁদের হাট। আর এখানেই নাকি রামচন্দ্রজির সঙ্গে সীতামাই-এর বিয়ে হয়েছিল। তারপর চলে যাই কিষাণগঞ্জে খাগড়ার নবাবের মেলা। সাহারসা জেলায় শিবরাত্রিতে সিংহেশ্বরের থানের মেলা—এসবই কি আমার নিজের স্মৃতি, নাকি আমার বাবার, অথবা তারও বাবার?

চিলকিগড়ের রাজবাড়ির সানাইয়ের হালকা হালকা সুর, রোশনাই—আলো—আলো, দাঁতালের মাথার ভেতর স্মৃতির কত রঙিন বল যেন ফেটে ফেটে ছড়িয়ে পড়ছিল।

ঘুমে থেকে, আবার না থেকেও তার মনে পড়ছিল সেই ছেলেটিকে, যে মশাল নিভিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়েছিল একলা একলা, মাঠের ওপর। মাথার ওপর তখন শুধুই চাঁদের জেগে থাকা।

ছেলেটি আবার স্মৃতি উসকে দিতে চাইছিল! আমরা কি রাজার হাতি? পোষা হাতি, রাজার?

হাওয়া বইছে ধীরে। খানিকটা দূরে সারা গায়ে মোটা একটা চাদর মুড়ি দিয়ে হিম থেকে বাঁচতে চাইছে পচা মাহাত। তার স্বপ্নেও তখন জঙ্গল। হেই রে কত বড় জঙ্গল গ। বাঘ, বন্না, হাতি। ঠিকাদার আসে জঙ্গল কাটে। দিখু আসে! জঙ্গল কাটে। কাঠ চালান যায় শহরে। জানোয়ারগুলান পালায়। মানুষ পালায়। তা সেই লালমুখা সাহেব। তারা হিটর-মিটর-খিটর কি সব বলে। ঘোড়ায় চড়ে আসে। সঙ্গে বন্দুক। তা আমরাও বাঁশ নি। কাঁড় নি। তীর-ধনুক। হুলের ডাক দেয় সিধু-কানু, চাঁদ-ভৈরব। পাতায়-পাতায় গিরা যায়। এপাড়া ওপাড়া। শালের গিরা। তিলকা মাঝি। বিরসা মুণ্ডা। পচা মাহাত স্বপ্নে থাকে।

তার মুখে চাঁদের এক টুকরো আলো। চাপা চাদর মুখ থেকে সরে গেলে, সেই আলো পচার মুখে পড়লে বড় দুঃখী মনে হয় তাকে। কিন্তু তবুও পচা স্বপ্নের ঘোরে কি যেন কি দেখে ফিক-ফিক-ফিক-ফিক করে হাসতে থাকে।

ঠিক তখনই আবারও এই ছবির ভেতর ঢুকে পড়ে সাবু। হুলা পার্টি নিঝুম। হাতিরা জঙ্গলে। কোথাও আগুন, মশাল, পটকা, হাউই, হই-চিৎকার, কিছুই নেই। যেন বা একেবারে শান্ত হয়ে গেছে সব কিছু। শেষ হয়ে গেছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ।

সাবু এতসব ভাবতে পারছে না। সে শুধু ভাষাহীন হয়ে দাঁড়িয়ে ফাঁকা মাঠে। যেখানে ধান কাটা সারা হয়ে গেছে। একটু দূরে বড় পুকুর আছে একটা। হাতিরা হয়তো বা সেখানে দলমা যাওয়ার আগে আর একবার স্নান সেরে শুদ্ধ হয়ে নেবে।

পুকুর জলে চাঁদ ভেসেছিল।

এতসব দেখার সময় ছিল না সাবুর। দূরে পুকুর জলে ভেসে থাকা চাঁদ তাকে হাতছানি দিলেও সাবু গেল জঙ্গলের দিকেই। যেখানে মাথা উঁচু সব শাল গাছ। জঙ্গলের খুব কাছে যাওয়ার হুকুম নেই ডি এফ ও সাহেবের। তবু সাবু ধীর পায়ে এগোচ্ছে। তার খালি পায়ের পাতার নীচে চামড়া-মাংস যদিও যথেষ্ট পুরু, তবুও কখনও পথে জেগে থাকা কী কী যেন ব্যথা দিচ্ছে তাকে।

বনের কাছাকাছি এসে খুব চাপা গলায় সাবু ডাকল, হাতিসাহেব শুনতে পাচ্ছ? হাতিসাহেব!

দাঁতাল কানখাড়া করল। তার কানে সাবুর গলার আওয়াজ আসছিল। বাতাস বয়ে নিয়ে আসছে সাবুর গায়ের গন্ধ।

এ গন্ধ কি আমার বন্ধুর? দাঁতাল ধন্দে ছিল।

তার ভেঙে যাওয়া স্বপ্নে তখনও রাজার বাড়ির সানাই, শেকল। শেকলের ঝনৃন—ঝনৃন শব্দ। আফ্রিকার সুপ্রাচীন বনভূমি। সেখানে আদিগন্ত ঘাসের বনে দল বাঁধা নীলগাই, জেব্রা, হঠাৎ হঠাৎ ছুটে আসা সিংহী—নীলগাইদের দৌড়। দাঁতাল চোখ পিটপিট করতে করতে তাকাল।

সাবুর গন্ধ তার পরিচিত ছিল।

সেই মাঠের ভেতর হুগলি জেলায়—যখন পটকা, হাউই, মশালের আগুন আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, দাঁতাল মনে করতে চাইল। অন্ধকারে দলের অন্যান্য পাহাড়-পাহাড় হাতিরা দাঁড়াচ্ছিল কাছাকাছি। সাবু আবারও ডাকল—হাতিসাহেব!

দাঁতাল সাড়া দিল।

সে সাড়া দেয়ায় জেগে ওঠে বনভূমি।

সাবু হয়তো তাকে কোনো কাহিনী শোনাতে চাইছিল। এমন কাহিনী যাতে হাতিদের আনন্দের কথা থাকে। সেই যে হাতিদের —হাতিদের নয়, হাতিরাজার বামুন-বৌ পাওয়া, যা কিনা দর্ভপাণিকে শুনিয়েছিল সাবু, তা কি আবারও শোনাবে যূথপতি দাঁতালকে? মরে আসা চাঁদের আলোয় সাবুর হাই উঠল। আর পর পর দুটো হাই

তোলার পর সে সামনে দেখতে পেল পৌষের কুয়াশা ঢাকা চরাচর। জঙ্গলের আবছা আড়ালে ঘরে ফেরা হাতিরা।

দাঁতাল কি আবার স্বপ্নে যাওয়ার জন্যে কোনো গল্প শুনতে চাই-ছিল? যদি সাবু বলে, তাহলে হয়তো বা খানিকটা ঘোরের মতন—তাতে একটা রাতের বাকিটুকু পেরিয়ে যাওয়া যাবে নির্বিঘ্নে আর সাবু যদি এটুকু পড়ত—বাংলা কাগজের এই রিপোর্টটি—তাহলে?

হাতির হানা বনসৃজনের ত্রুটিতেই

'নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর, ৭ জানুয়ারি: 'দক্ষিণবঙ্গের চার জেলায় সামাজিক বনসৃজনের জন্য প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বর্ধমানের বিশাল বনভূমিতে তৃণভোজী প্রাণীদের খাদ্য এখন প্রায় পাওয়াই যায় না। সামাজিক বনসৃজনের নামে বন তৈরি করা হয়েছে মানুষের প্রয়োজনীয় কাঠের জন্য। খাদ্যাভাবের জন্যই হাতির মতো তৃণ-ভোজী জীব ধাওয়া করছে লোকালয়ে। খাদ্য সংগ্রহে বাধা পেয়ে তারা মানুষ মারছে। ধন সম্পত্তি নষ্ট করছে।

'১৯২১ থেকে ১৯২১—এই দশ বছরে বিশ্বব্যাঙ্কের টাকায় পশ্চিমবঙ্গে যে ব্যাপক বনসৃজন হয়, তার প্রধান লক্ষ ছিল গ্রামের মানুষের জ্বালানি ও ঘরবাড়ি তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় খুঁটি ও কাঠের চাহিদা মেটানো। সেটা পূরণ হয়েছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু এক বা দুরকম প্রজাতির, মনোকালচার গাছলাগানোর জন্য আজ দক্ষিণবঙ্গের চার জেলার জঙ্গলে তৃণভোজী জন্তুর খাদ্য উবে গেছে।

'মেদিনীপুর (পূর্ব) ডিভিসনের ডিভিসনাল ফরেস্ট অফিসার মনে করেন, বন দপ্তর জঙ্গল তৈরির সময় বন্যপ্রাণীদের কথা সম্পূর্ণ ভুলে ছিল। সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পের এটাই সবচেয়ে বড় ভুবাক। তিনি বলেন, বোধহয় এই জন্যই হাতিরা

অতীতের জঙ্গল ঘেরা গ্রামে বাসিন্দাদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করত, আজ খাদ্যাভাবের জন্য সেই হাতিরাই মানুষের খাদ্যশস্যে ভাগ বসাতে গ্রামের কাছাকাছি, কিংবা গ্রামের ভেতর ঢুকে পড়তে বাধ্য হচ্ছে। অন্য দিকে গ্রামবাসীরাও কষ্টার্জিত শস্য বাঁচাতে তীর-ধনুক, মশাল, পটকা ব্যবহার করে হাতির পাল তাড়াতে চেষ্টা করে। অনেক সময় টায়ারে আগুন লাগিয়ে ছুড়ে মারা হয়।

'ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার মনে করেন, এই ধরনের প্রতিরক্ষার আঘাতেই শান্ত, ভদ্র, গোষ্ঠীবদ্ধ জীবরা যন্ত্রণায় পাগল হয়ে যায়। এবং পরে দু'পেয়ে জীব দেখলেই ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে হামলা করে। 'প্রাকৃতিক বনে হাতির জন্যে চারস্তরের খাদ্য প্রচুর পরিমাণে থাকে। মাটির তলায় কন্দ, মূল, মাটির ওপর বিশেষ ধরনের ঘাস ও গুল্ম যেগুলো—জলাভূমিতে প্রচুর জন্মায়, এছাড়া আছে ছোট গাছ যেমন—কলা, কুল, আমলকি, পড়শিঝোড়া ইত্যাদি। চতুর্থ স্তরে আছে বট, শিশু, গামার, বাবলা, কাঁঠাল, আম, জাম, ডুমুর ইত্যাদি বড় বড় গাছ। বনসৃজন প্রকল্পে হাতির খাদ্য এইসব গাছের কোনো অস্তিত্ব নেই। আছে শুধু শাল অথবা ইউক্যালিপটাস। যা থেকে হাতির কোনো খাবার পাওয়া যায় না।'

এসব তথ্য সাবু দিল কি? না দিলেও যেন বা আকাশ থেকে ভেসে আসা আকাশবাণী হয়ে এই সব কিন্তু ঢুকে যাচ্ছিল দাঁতাল-যূথপতির কানে। বড় কান নড়ছিল কি নড়ছিল না। তবু বাতাস তার কানে এসব শব্দ পৌঁছে দিতে পারছিল।

আমাদের খাবার নেই ভাই। থাকার জায়গা নেই। জঙ্গল কমে যাচ্ছে। শাল জঙ্গলের বদলে ইউক্যালিপটাস। তাই তো এভাবে হুড়মুড় করে দল বেঁধে এসে পড়া শহরে।

হাতিসাহেব, নাকি গণেশবাবা—কী বলবে সাবু এখন এই সব বন্ধুদের! হাতিবাবাও তো বলা যেতে পারে, নাকি! সাবু নিজের কাছে নিজে জানতে চাইল।

সাবুর জানতে ইচ্ছে করল—মনে পড়ে রাজবাড়ির পিলখানা! ভোরের সানাই!

দাঁতাল যেন বা হাওয়ার নড়াচড়ায় বুঝে নিতে পারে সবকিছু—সে সাবু কিছু বলুক আর নাই বলুক। তবু তার মন বলল, সব মনে আছে ভাই। মাহুতের হাতের ডাঙশ, পায়ের শেকল। তার ঝন্ ঝন্ শব্দ। চলতে-ফিরতে শেকল বাজে।

এ-হয়ত দাঁতালের নিজের স্মৃতি নয়। তার পিতা, পিতামহের স্মৃতি। কিংবা আদৌ কোনো স্মৃতি নয়, হয়তো অরণ্যই তার আদি—তবু তো কথা বলতে হয়।

সাবু এখন এই নিভে আসা চাঁদের আলোয়, হিমের নিচে হাতির সঙ্গে কথা বলছে।

গণেশবাবা, আমার মায়ের বাত ভালো হয়ে গেছে? সাবু জানাতে চাইল।

দাঁতাল কি শুনতে পেল!

আর তখনই পচা মাহাত ঘুমের ভেতর শাল মহুল ফুলের গন্ধ পেয়ে যায়। কত কত শাল ফুল ফুটেছে। পাশাপাশি জেগে আছে শালের কচি পাতা। মহুয়ার রঙে ঢেকে যাওয়া পথের ওপর তার খালি পা। পায়ের পাতা। পাতার নিচে থেঁতো হয়ে যাওয়া শাল ফুল। ঘুমের ভেতরও পচার মুখে হাসি ফুটে উঠল। চারপাশে কত সবুজ। শালের কচি চারা। চারারা হাওয়ায় মাথা দোলাচ্ছে।

দূরে কোথাও বুঝি আবছা সুরে ধমসা-মাদল বাজছে।

পচা মাহাত স্বপ্নকে পুরো করতে চাইল। আকাশ ভরেছিল তারায়। উত্তরের বাতাস বইছিল নিজের নিয়মে।

৭। একটি অসমাপ্ত গল্পের কাঠামো

কতদিন বেনারস যাওয়া হয়নি—এমনটি ভোরবেলায় ভেবে, তখনও ভোর হয়নি, চারপাশে শীতের শেষ রাতের অন্ধকার, যেন-বা আঠা দিয়ে বসানো—সেদিকে তাকিয়েই আবার মন খারাপ হয়ে গেল।

যদিও ওর গায়ে হালকা কম্বল, তবুও দোতলার জানলা থেকে, একটা পাল্লা খোলাই থাকে—নইলে মনে হয় দম বন্ধ হয়ে আসছে, সেদিকে তাকিয়ে ইরা কালি লেপা আকাশ দেখতে পেল।

ঘুমের মধ্যে তার স্বপ্নে কাশীর ঘাট, তা সাজানো রয়েছে অনেক অনেক ছাতায়। ছাতার সেই বাহার, রওনক কোনোটাই এখন আর নেই—কিন্তু স্বপ্নে বেনারসের দশাশ্বমেধ, অহল্যা বাঈ, কেদার—খোলা ছাতারা, তার নিচে ঘাটপাণ্ডা, পুণ্যার্থী, মাথায় চন্দনের ছাপ, দক্ষিণা —সব পর পর এসে যায়। ঘাটপাণ্ডাদের কাছ থেকেই পাওয়া যায় ভিজে মাথা আঁচড়াবার চিরুনি, হাত-আয়না, মাথায় লাগাবার তেল—

বালিশের পাশে খুলে রাখা আছে চশমা, তা চোখে না দিয়ে এত সুন্দর স্বপ্নের ভেতর পৌঁছে গেছিল ইরা।

কেবল খানিকটা দেখার পর, সবগুলো ছাতাই উল্টে গিয়ে স্টার টিভি-র ডিশ অ্যান্টেনা হয়ে গেল। বেনারসের গঙ্গার ঘাটের সব ছাতা ডিশ অ্যান্টেনা—এতবার দেখা চোখের সামনে। এমন কী সত্যজিৎবাবুর 'অপরাজিত' আর 'জয় বাবা ফেলুনাথ' ছবিতে সেই সব ছাতা, গঙ্গা, ঘাটের উড়ন্ত পায়রা—সব ছাতাই বদলে গিয়ে ডিশ অ্যান্টেনা।

ঘুম ভেঙে আকাশের দিকে তাকাতে ভয় পাচ্ছিল ইরা। আর তখনই জানলা থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে, এই শীতে নিজের গায়ে কম্বলটি আরও ভালো করে টেনে ইরা দেখল পাশের ঘরের দরজা দিয়ে এক চিলতে আলো। ওপাশে বুচকুন, কোলবালিশ ঠিক আছে। এপাশে সুবিমল নেই।

আসলে সুবিমল বিছানা ছেড়ে উঠে এখন একাই গল্প লিখতে চাইছে।

সে রাতের হাতি, রহস্যময় চাঁদ, হাতিবিশারদ দর্ভপাণি রায়, এস, পি. আবিদ খান, জিপ গাড়ি, দৌড়ে যাওয়া মশালের আলো, ভিড়, গোলমাল—তার সঙ্গে নিজের বাড়ি—সব মিলিয়ে যদি একটা গল্প হয়। গল্পের প্রথম লাইনটা এসে গেলে অনেকটা গড়িয়ে যাওয়া

যায়, সুবিমল চেষ্টায় ছিল।

গল্পটা সে এভাবে শুরু করতে চাইছে—

'ছেলেটা দাঁড়িয়ে। ছেলেটার হাতে মশাল।

ছেলেটার গায়ের পুরো হাতা গেঞ্জির বুকে লেখা র‍্যামবো—ইংরেজিতে।'

ছেলেটার নাম যেন কি!

সুবিমল মনে করতে চাইল।

চোখের সামনে টেবিল ল্যাম্প। টেবিলের ওপর অ্যাশপটে সিগারেট। সিগারেটের মুখে ধোঁয়া। তুলে নিয়ে একবার আস্তে টান দিল সুবিমল। তারপর আগের লাইনগুলো কাটতে কাটতে তার মনে হলো এতটা সোজাসুজি লেখা ঠিক হবে না।

সুবিমল নতুন করে লিখতে শুরু করল।

'হাতিরা চলতে আরম্ভ করল। সামনে বাঁশের ঝাড়। আকাশে চাঁদ ছিল।'

কী মুশকিল, আর এগনো গেল না। কিছুতেই এগনো যায় না। কবে একবার দু-বার স্কুল ম্যাগাজিনে লিখেছে সে। এক দু-বার কলেজ ম্যাগাজিনেও—সেও তো বড় জোর দু তিন পাতা, এখন হঠাৎই তাকে লিখতে বলা, সেও গল্প—এতেই বেশ বিপদে পড়ে যাওয়া সুবিমলের। আসলে এর সূত্রও সেই প্রদীপ, কাহিনীর গোড়ার দিকে কথা বলে যাওয়া রিপোর্টারটি।—আপনি পারেন একটা গল্প দাঁড় করাতে, নামিয়ে ফেলুন না। প্রদীপ গলায় বেশ সিরিয়াসনেস এনেই বলেছিল।

আসলে লিখতাম-টিখতাম এক সময়, জানো। স্কুল-ম্যাগাজিনে লিখেছি। কলেজ-ম্যাগাজিনের এডিটোরিয়াল বোর্ডে ছিলাম, সেখানেও বেশ কিছু লেখাটেখা। তারপর যা হয়, চর্চার অভাব। এখন আর সাহসই পাই না। আসলে এসব লাইনেই যাওয়া উচিত ছিল আমার—চাকরি করে, বিশেষ করে এই আমাদের মতো চাকরি করে কিছু হয় না। দিনরাত টেনসড্ হয়ে থাকা। কাজের প্রেশার।

সে দিক দিয়ে তোমাদের খবরের কাগজে সুবিধে কত। লেখার মধ্যেই থাকা।

প্রদীপ চুপ করেছিল। খবরের কাগজের চাকরি মানেই তো গল্প লেখালেখি নয়। তার জন্যে আলাদা লোক আছে, সব কাগজেই। তারা কেউ কাগজের অফিসে চাকরি করে, কেউ করে না। তাতে হলোটা কি। রিপোর্টার মানে তো অ্যাসেমব্লি, রাইটার্স, ইউনিভার্সিটি, লালবাজার, কর্পোরেশন—খবরের এক একটা বেসিক সোর্সকে বারে-বারে টোকা মারা। রেগুলার বিট তো থাকেই এই সব জায়গায় তার সঙ্গে অন্য কনট্যাকট, আলিপুরের হাওয়া আফিসে দিনে একবার খোঁজ নেয়া। মনসুন আসার দেরি হলে, ক্রমাগত যদি বৃষ্টি হয়েই যায়, তাহলে আরও একবার ফোন ঘুরিয়ে হাওয়া অফিসের সঙ্গে কথা বলা। আর এই যে সুবিমল সেনকে গল্প লিখতে বলা, এও তো তার কনট্যাকটেরই রেজাল্ট। কোম্পানি বলেছে, লিখিয়ে আনো দেখি—

আপনি লেখাটা বেশ জমিয়ে দাঁড় করান তো। প্রদীপ উৎসাহ দেয় সুবিমলকে—দাঁড় করিয়ে দিন। নামান না আগে। তারপর দেখা যাবে। দেখা যাক কী করতে পারি।

কী করতে পারি বলতে প্রদীপ হয়তো তার বাংলা দৈনিকের সঙ্গে প্রকাশিত মাসিক কাগজ 'প্রিয়দর্শিনী'-র দিকে ইঙ্গিত করে, কিংবা এরকমই মনে হয় সুবিমলের।

'হাতির সঙ্গে হাতাহাতি'—এ-নামে শিবরাম চক্রবর্তীরই বোধহয় একটা বই ছিল। সুবিমল ভাবতে চেষ্টা করে। তার হাতে সিগারেট ধোঁয়া হয়ে যায়। রাত গড়ায় ভোরের দিকে।

বিছানার এক দিকে কোলবালিশ ঠিক আছে, আর এক দিকে ঘুম জড়ানো বুচকুম। বাইরে আধ খোলা জানলা দিয়ে যে শীতের আকাশ দেখা যায়, সেখানে কারা যেন ছিটিয়ে দিয়েছে তারার কুচি। কবে যেন কোন বালকবেলায় ইরার জানা ছিল সেই ধাঁধাটি—'এক থালা সুপারি/ গুনিতে না পারি'। কিংবা অন্য কিছু, তার মনে পড়ল বিছানায় শুয়ে।

নাকি বুচকুনের গালে একটা চুমু খাওয়ার পর, রাতে জেগে উঠল এমন তো মাঝে মাঝেই করে ইরা, তার মনে হয়—এ জীবন আর কত দিন! এই নিশ্চিন্ত, নিরুপদ্রব জীবন ছাতের নিচে, যেন সব কিছুই সাজানো, তার মধ্যে হঠাৎ চলে যাওয়া। চিরকালের জন্যে চলে যাওয়া। আর ফেরা যায় না। স্বপ্নের ভেতর ছাতারা সবাই ডিশ-অ্যান্টেনা হয়ে গেলেও না। তবু চলে তো যেতেই হয়, কারও রেহাই নেই এর হাত থেকে। ভাবতে-ভাবতে শিরদাঁড়ার ভেতর শীত ঢুকে পড়ছিল ইরার। বাইরের আকাশ তখনও তেমনই কালো।

কী ভেবে বুচকুনকে আবারও জড়িয়ে নিতে চাইল ইরা, কোল-বালিশ সরিয়ে। বুচকুন ইরার বুকের ছায়ায় চলে এলো।

সুবিমল আসলে লিখতে চাইছে একটা বনের কাহিনী। বন মুছে যাওয়ার কাহিনী। তার সঙ্গে হাতিদের গল্প। সেই গল্প, যে গল্পে মানুষও আছে—এমনকি সাবু নামের সেই ছেলেটিও। কপালে হালকা হালকা ঘাম জমছে সুবিমলের।

টেনসন হলে শীতেও ঘাম জেগে উঠতে চায়। নাকি এ তার নেহাতই মনের ভুল!

গল্পটা একবার শুরু হয়ে গেলে চলতে থাকবে গড় গড় গড় গড় করে। নিজের মতো।

'সেই বাঁশবাগানের মাথায় চাঁদ ছিল। চাঁদের হালকা হালকা আলো পড়েছিল বাঁশঝোপ, আর কলাবাগানের গায়ে। এমন জ্যোৎস্নায় এই বাঁশঝোপ, কলাবাগান হেসে ওঠে।'

সুবিমল নতুন সিগারেট টানতে টানতে পরের লাইন ভাবছিল।

'হাতিরা পটকা, হাউই, মশালের আগুন এড়িয়ে ঢুকে পড়তে চাইছিল শহরের দিকে। যদি শহরে হাতি চলে আসে। কলকাতার রাস্তায় দলমার হাতির পাল। ময়দানে শহিদ মিনারের কাছাকাছি, ব্রিগেডে। রাজভবন, মহাকরণ, বিধানসভার কাছাকাছি—হাতি আর হাতি।

'অফিস, স্কুল, কলেজ, দোকান-বাজার, সব বন্ধ হয়ে গেছে। খালি

ক্যানিং স্ট্রিটে পটকার দোকান খোলা। খুব পটকা বিক্রি হচ্ছে। হাতি এলে পটকা ফাটিয়ে তাড়ানো যায়, এমনটি কাগজে-কাগজে পড়া আছে সবার। এক সময় ছড়া জানা ছিল আমাদের, 'বন থেকে বেরলো টিয়ে / সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।'

সেই ছড়ার মানে ছিল আনারস।

'আর এখন হয়েছে বন থেকে বেরলো হাতি....'

এ অব্দি লিখে সুবিমল আবারও জোরে একটা টান দিল সিগারেটে। তার কাশি এসে গেল। অ্যাশপটের পাশে সিগারেট রেখে সুবিমল আবারও লিখছিল, 'নবীন'—নবীন নামটাই গল্পের নায়কের নাম ভেবে নিয়েছে সুবিমল।

'নবীন দেখতে পাচ্ছিল তার সামনে দিয়ে হাতিরা জঙ্গলে চলে যাচ্ছে। তাদের মেঘরঙ—বর্ষার মেঘ তো এরকমই হয়ে থাকে, পিঠের দিকে তাকিয়ে নবীনের অনেক কাল আগে শোনা 'মেঘপাতাল' শব্দটি মনে পড়ে গেল।

'মেঘপাতাল কথাটি সে শিখেছিল মেদিনীপুরে থাকার সময়। তখন আরও অনেক কথা জানা হয়েছিল। দূরে দিল্লি রোডের ওপর সার দিয়ে দাঁড় করানো লরি। তাদের সবার সার্চ লাইট পড়ছিল সামনের ফাঁকা মাঠের ওপর। আলোয় আলোয় ঘাড় ধাক্কা খাচ্ছিল রাতের কালো।

লাইনটা লিখে—'আলোয়-আলোয় ঘাড়ধাক্কা খাচ্ছিল রাতের কালো'—বেশ আরাম পেল সুবিমল সেন। তারপর অ্যাশপট থেকে সিগারেটটি তুলে নিয়ে নিজের ঠোঁটে বসিয়ে ধীরে টানতে লাগল।

ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় মাথার ভেতরে হালকা হালকা কুয়াশা তৈরি হলে সুবিমল আবারও ডট পেনের পেছন দিকটা বার দুই আলতো করে কামড়ে নিয়ে লিখতে লিখতে, খাতার পাতায় অক্ষর বসাতে বসাতে আবার দেখতে পেল সেই দিল্লি রোড, দাঁড়িয়ে থাকা লরি, ট্রাকের সারি, তার হর্ন। হাতিবিশারদ পার্থপাণি রায়—হাতি তাড়াতে তাদের সবার মিলেমিশে বাঁশবনে ঢোকার চেষ্টা।

আকাশে যে চাঁদের আলো তা থেকে কিছুটা উড়তে উড়তে নেমে আসছিল পৃথিবীর গায়ে।

'নবীন ঢুকে পড়তে চাইছিল বনের ভেতর। আশেপাশে ঝিঁঝির ডাক—লিখেই আবার কেটে দিল সুবিমল। শীতকালের রাতে কি ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকে—দরকার কী এত ডিটেলে যাওয়ার! তার থেকে তো অনেক জরুরি গল্পটা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। সামনে। আরও সামনে। ঘটনার ভেতর দিয়ে দিয়ে।

'নবীন একজন সাহসী, সৎ, সরকারি—এত লেখার দরকার আছে কি?

এসব ভেবে—নবীন থেকে সরকারি পর্যন্ত—সব কেটে দিল সুবিমল।

তারপর চুপচাপ সিগারেট টানতে লাগল একা একা।

গল্পটি জমে গেলে, ছাপা হাওয়ার পর একটা কপি পাঠাতে হবে মন্ত্রীকে। দর্পপাণি রায়কে। আর আবিদ হোসেনকেও এক কপি।

ওরা সবাই আছে এই গল্পের ভেতর। আলাদা আলাদা নামে। একটা চেয়ারে বসে, হেলান দিয়ে, অন্য চেয়ারে পা তুলে দিয়েছে সুবিমল। দুচোখের পাতা ঘুমে ভারি হয়ে আসছে, তবু একটা লাইন। আরও কয়েকটা লাইন। গল্পটা একটু চলতে আরম্ভ করলেই তারপর তর তর তর তর তর তর করে এগোয়। যেমন হয়ে থাকে।

নবীনের কি কোনো ফ্যামিলি থাকবে? সন্তান? একটি না দুটি?

দুটির বেশি তো কখনই নয়। সুবিমল আবারও টান দিল সিগারেটে।

তার কি প্রেমিকা থাকতে পারে? নবীনকে কি অবিবাহিত করলে ভালো হবে? যদি অবিবাহিত হয় নবীন, তাহলে সে কেমন করে তার ছেলের জন্যে 'লিও' গান কিনে আনবে!

'লিও' গান না কিনলে গল্পের সেই পরিণতিতেই তো পৌঁছন যাবে না, যা ভেবেছে সুবিমল। আসলে একটা নিটোল, জোরালো গল্প চাই। নবীনের বৌ কি চোখে হাই পাওয়ারের চশমা নিয়েছে? পেটে

গ্যাসট্রিক আলসারের ব্যথা? সে কি রোজ 'রেইনট্যাক' খায়? কিংবা 'জেনট্যাক'? হজমের আরক?

ইরার ব্যাপারটা কি ঢুকে যাবে নবীনের বৌয়ের ভেতর? নবীনের বৌয়ের নাম, বৌয়ের নাম, বৌয়ের নাম—মাধুরী, বেশ বেশ মাধুরী।

নাহ, কেমন যেন ফিল্ম স্টার ফিল্ম স্টার হয়ে গেল, তার চেয়ে দেবশ্রী—ধ্যুস, সেও তো ফিল্ম স্টারের নাম। তাহলে নন্দিনী—বেশ বেশ। বেশ একটা রাবীন্দ্রিক ব্যাপার আছে। নন্দিনীই থাক।

আর হিরোর নাম নবীন। সেও তো নবীন নিশ্চল নামে একজন ফিল্ম স্টার, এখনও তো টি ভি সিরিয়াল করে। কিরকম বুড়োটে মেরে গেছে নবীন নিশ্চলের চেহারা। অথচ এক সময়ের রোমান্টিক নায়ক। সময় তো এভাবেই খুবলে নেয় সব কিছু।

তাহলে নবীন নামটাই কি পাল্টে দেব—সুবিমল কিছুই ঠিক করতে পারছিল না। থাক নবীন, কী আর হবে! তার বউ নন্দিনী। নন্দিনীর পেটে আলসার নেই। চোখে নেই হাই পাওয়ারের চশমা। সেই নন্দিনী, তাকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিল সুবিমল। ফরসা, কোঁচকানো-কোঁচকানো—খুব বেশি কার্ল নয়, থাক-থাক কালো চুল মাথা ভর্তি।

সুবিমল তার কী কোনো বাল্য অথবা কৈশোরের প্রথম স্বপ্ন, তারপর স্বপ্নভঙ্গের ছবি দেখতে পাচ্ছিল। আর নন্দিনী—সুবিমল যাকে নিয়ে একটা লাইনও এখন পর্যন্ত লেখেনি, সে খাতার পাতা থেকে উঠে এসে সামনে বসে নিজের রূপ-গুণ সম্বন্ধে বলে যাচ্ছিল। 'আমি নন্দিনী বসু। পাঁচ ফিট সাড়ে চার। হিল তোলা জুতো পরি। শাড়ি আমার সবচেয়ে প্রিয় পোশাক, আর সালোয়ার কামিজ। রঙ যদি হয় আকাশী, নীল, নয়তো পিঙ্ক।'

আসলে নন্দিনী তো ফরসা, যা পরবে তাই মানায়। পায়ের নখ, হাতের নখে, কফি রঙের নেল পালিশ। ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক। নন্দিনী খুব ব্যক্তিত্বময়ী। রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারে। অতুলপ্রসাদ। রজনীকান্ত সেন। 'ছায়া ঘনাইছে বনে বনে / গগনে গগনে ডাকে দেয়া'

—তার প্রিয় গান।

এতসব যোগ 'বিয়োগ করছে সুবিমল। আর এই যোগ' বিয়োগ গুণ-ভাগের ভেতর তাকে নতুন নতুন সিগারেট খেতে হচ্ছে। ধোঁয়া শুকিয়ে দিচ্ছে জিভ। টাগরা। তবু তার সামনে নন্দিনী। এখনই। দাঁড়িয়ে। সুবিমল নন্দিনীকে ধরতে চাইল।

হাই নন্দিনী—নবীন কি এভাবে ডাকবে নন্দিনীকে! কিংবা—হ্যালো—মিস বসু! অথবা আসুন। কিংবা এই যে—কিছুই বলতে পারছে না সুবিমল। তার সামনে তখনও সেই বাঁশবাগান, চাঁদের টিপ লাগা অন্ধকার। বাঁশবাগানের ভেতর অন্তত চল্লিশটি হাতি। আর তারপর দূরে দূরে নিভে আসা মশালের আলো। হাউয়ের আগুন। টায়ার জ্বালানো রোশনাই। কালো ধোঁয়া।

নন্দিনী, যদি এরকম হয়, হাতি উদ্ধারে—স্যরি, হাতি তাড়িয়ে দলমায় ঠেলে দেয়ার সময়, তুমিও থাক নবীনের পাশাপাশি তাহলে—ব্যাপারটা খুব একঘেয়ে হয়ে যাবে—না? ট্র্যাডিশনাল? আর যদি হাতিরা তোমায় তাদের দলের ভেতরে নিয়ে নেয়। যদি নিয়ে যায়! সিগারেটে আবারও ঘনিষ্ঠ টান দিল সুবিমল। তাহলে, তাহলে নন্দিনী—কেমন হবে? কেমন হয়?

যদি সত্যি সত্যি নন্দিনী সাহানিয়াবিবি হয়ে যায়!

কে, কার গলা? কে?

সুবিমল চমকে ওঠে। আর তার ঘরের ভেতর সাবুকে দেখে আবারও এক দফা চমকে ওঠে সুবিমল। সেই ছেলেটা, এখানেও! এত রাতে।

ও স্যারবাবু, সাহনিয়াবিবিকে আনো না। তোমার নন্দিনী—

আমার নন্দিনী! পাকা পাকা কথা তো খুব। তুই অ্যাতো রাতে ঢুকলি কী করে এ ঘরে? সুবিমল গরগর করে উঠল।

সে কথা থাক স্যারবাবু, বালকের গায়ে তেমনই 'র‍্যামবো' লেখা কুল হাতা গেঞ্জি, হাফ প্যান্ট। তার রঙ হয়ত খাকি। খালি পা। হাসলে তেমনি তার সাজানো দাঁত উথলে ওঠে।

সাহানিয়াবিবি। হ্যাঁগো স্যারবাবু, হাতি ধরা ফান্দিরা তাকে মানে। সেই মেয়ে খুব সুন্দর। আসামের জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় বলে। সঙ্গে তার বুনো হাতির পাল। মাঝে মাঝে ফান্দিদের দেখা দিয়ে সে হাতের আঙুল তুলে বলে, কটা হাতি ধরবে। একটা দুটো না তিনটে। তার কথার বাইরে চলতে পারে না কোনো ফান্দি। সাহানিয়াবিবির সামনে ভাত রেঁধে ভোগ দেয় ফান্দিরা। ধুনি জেলে দিয়ে প্রণাম করে। তিনি তুষ্ট থাকলে—

তাহলে আমরা যখন হাতি তাড়াচ্ছিলাম, তুমি বললে না কেন সাহানিয়াবিবির কথা?

তখনও জানিনি স্যারবাবু।

পরে অনেক পরে, জেনেই মনে হলো—তোমার গল্পের নন্দিনী যদি সাহানিয়াবিবি হয়, আর সে মিশে যায় হাতির পালের মধ্যে। চলতেই থাকে। চলতেই থাকে। নতুন নতুন বন গজিয়ে ওঠে তার চলার সঙ্গে সঙ্গে। চারপাশে কত সবুজ। আহা গো, কত সবুজ। শাল ফুল, মহুয়া ফুলের গন্ধ। হাতি যায়। দল বেঁধে যায় মেঘবরণ হাতি। তার সঙ্গে সাহানিয়াবিবি। বিবির রূপে দশ দিক আলোয় আলো। তোমার নন্দিনী, ও স্যারবাবু, তোমার নন্দিনী যদি সাহানিয়াবিবি হয়।

সাবু কেমন যেন ঘোরে ছিল। সে যেন বা তরাইয়ের হাতি গেলা সবুজ অন্ধকার দেখতে পাচ্ছিল। বনস্থলীর ছায়া ছায়া অন্ধকার আরও গভীর হয়েছে আকাশের মেঘে মেঘে। তার ভেতর দিয়ে ধীরে চলা হাতিরা।

এ-হাতি মানুষ মারে না। গুণ্ডা হয় না। ধান খায় না। ভুট্টা খেতে হামলা করে না। আর সেই চাঁদের যেমন আলো—সেই রঙেরই কাপড় পরা সাহানিয়াবিবি। যদি বৃষ্টিও নামে আকাশ ভেঙে, তবু বিবির কাপড়, থান, গোটা গা শুকনো থাকে, এ কেমন মজা গো! এসবই দেখতে পায় সাবু। সে আরও কিছু বলতে গিয়ে একবার তাকায় সুবিমলের দিকে।

সুবিমলও তাকিয়ে থাকে তার দিকে। তারপর তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় সুবিমল বলে ওঠে, নন্দিনী কেন সাহানিয়াবিবি হবে?

নন্দিনী যদি সাহানিয়াবিবি হয়, তাহলে সেই লেখা সত্যি সত্যি একেবারেই পড়তে চাইবে না কেউ। তার চেয়ে আমার নন্দিনী, নবীনের নন্দিনী এই বনছায়ে, বাঁশবাগানের আড়াল থেকে উঁকি দেয়া চাঁদের আলোয়—

বড্ড কাব্য হয়ে যাচ্ছে লেখাটায়—এমনই মনে হলো সুবিমলের। কাব্য, এই ন্যাকা-ন্যাকা ব্যাপারটা প্রোজের ক্ষতি করে—এরকম মনে হলো সুবিমলের।

সাবু তখনও দাঁড়িয়ে।

এই অলীক কথোপকথনের আর তো সাক্ষী নেই কোনো। দূরে কোথায় যেন রাত ফুরিয়ে আসার সংকেত। সুবিমলের হাই ওঠে। চোখ জ্বালা করে। নতুন সিগারেট খেলে আবারও বুকে লাগবে, কাশি উঠে আসবে। তারপর ঠোঁট জ্বালা, ধোঁয়ায় দু চোখ জ্বালা করে ওঠা—সবই তো আছে।

নবীনকে নিয়ে তবুও সুবিমল কিছু লিখতে চাইছে। নবীনকে নিয়ে, নন্দিনীকে নিয়ে, আর পলাতক চল্লিশটি হাতি, যারা দলমার নীলাভ সবুজ থেকে নেমে এসে আবারও সেই রঙে ফিরে যাচ্ছিল।

আচ্ছা, গল্পটা যদি এরকম হয়, ধরো, নন্দিনীর সঙ্গে অনেকদিন ছাড়াছাড়ি নবীনের। তাদের সন্তানকে নিয়ে বাঁকুড়ার কোনো গ্রামে মাস্টারি করে নন্দিনী। আর নবীন—সে এই হাতি তাড়াতে তাড়াতে, কিংবা ধরো হাতি তাড়ানোর রিপোর্ট লিখতে লিখতে, যদি নবীনকে একজন সাংবাদিকই করে দি-ই শেষ অব্দি বাঁকুড়ায়, শীতের রুক্ষ একটু একটু যেন লালচে মাটির ধুলো উড়ে যাওয়া পটভূমিতে যদি নন্দিনীকে নতুন করে আবিষ্কার করে নবীন!

সাবু কী বলবে—এরকমটি বলে সুবিমলের নিজেরই মনে হলো, পঞ্চাশ বা ষাটের কোনো বাংলা ফিল্ম আসলে। উত্তম-সুচিত্রা, নাকি

সুচিত্রা-উত্তম। সেখানে উত্তমকুমারের গলায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা সেনের গলায় সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। পাশাপাশি নিশ্চয় থাকবেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপতি চাটুয্যে, সন্ধ্যারানী, ছায়াদেবী, মলিনাদেবী, বিকাশ রায়, অসিতবরণ আর আরও কে কে—

তাহলে গল্পটা নিয়ে এভাবে এগোনো যাবে না। আসলে একটা নতুন কিছু। নতুন কিছু—

নতুন। একেবারে নতুন—আঙ্গিকে নয়তো ভাষায়—

সাবু! সাবু—

ভ্যানিশ। ভ্যানিশ।

পর পর দুটো লাইনের কথাই নিজেকে বলা সুবিমলের। সিগারেটে টান দিতে দিতে আবারও হাই উঠল তার।

বাইরে শীতের আকাশ একটু একটু করে পরিষ্কার হয়ে উঠতে চাইছে। আর কিছুক্ষণ পরেই নতুন আলোর ডিটারজেন্টে গোটা আকাশটাই কেচে ফেলা হবে। তারপর আকাশে চমৎকার রোদের ডিজাইন।

ঠিক তখনই বুচকুনকে জড়িয়ে ঘুমের ভেতর একটা বিশাল—প্রায় আকাশছোঁয়া হাতির স্বপ্ন দেখছিল ইরা। গজরাজের শরীর ফুলে ফেঁপে দূরে আরও দূরে চলে গেছে। দুটি বড় বড় গজদন্তে জ্বলে ওঠা টিউব আলো। অন্ধকারে দুটি শাদা গজদাঁত চমকালে স্বপ্নের ঘোরে টিউব আলোর কথাই মনে পড়ে যায় ইরার। তার ভয় লাগে। খুব ভয়। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসে।

দাঁতালের বৃংহণ শোনা যায় ঘুমের ভেতর। ইরা কেঁপে ওঠে। বুচকুনকে জড়িয়ে ধরে জোরে। আরও জোরে।

ক্লান্ত সুবিমল টেবিল-আলো নিভিয়ে দেয়।

হ্যালো—সুবিমলবাবু!

হ্যাঁ, হ্যাঁ বলছি—

আপনার গল্প কদ্দুর? ইস্যুটা ডেড হয়ে গেলে তো আর চালানো যাবে না কভার স্টোরির সঙ্গে। 'প্রিয়দর্শিনী'তে আপনারটা প্রচ্ছদ-গল্প। বেসড অন রিয়েল লাইফ। হাজার পাঁচ ছয় শব্দ। বেশি নয়। এ-সংখ্যায় হাতির শহরে আসা নিয়ে প্রচ্ছদ-কবিতাও থাকছে ছটি। সব কবিতা পেয়ে গেছি আমরা, বাকি খালি আপনার লেখাটা। মানে আপনার গল্পটা আপনি দিলেই—

হ্যাঁ, দিয়ে দিচ্ছি। হয়ে এসেছে।

আসলে আপনার রিয়েল-লাইফ অভিজ্ঞতা আছে বলেই—আমরা তো আসলে রিয়েল-লাইফের ওপর—

বুঝেছি ভাই, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর দুটো দিন সময় দাও।

দু দিনের বেশি কিন্তু সময় নেবেন না। ধরাতে পারব না।

ওদিকে টেলিফোন নামানর শব্দ পেয়ে সুবিমল যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

উফ, একটা লেখা দাঁড় করান—আকাশ, অন্ধকার, জ্যোৎস্না, হাতি, নবীন, নন্দিনী, দলমা পাহাড়ের ল্যান্ডস্কেপ, হাতিদের আসা আর চলে যাওয়ার রুট-ম্যাপ—সব নিয়েও এত নাটা-ঝাপটা—নবীন যেন বা এক বুক জলে ছিল।

৮। দাঁতাল ও দর্ভপাণি

তেনজিং নোরগে রোডের ওপর এই হলিডে হোমের সামনে একটা সোনালী চুড়ো মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বৌদ্ধ গুমফা। গায়ের রঙ লাল। গুমফায় ঢোকার দরজার মাথায় সোনা রঙের জোড়া হরিণ, একটু যেন মুখ তুলে আছে আকাশের দিকে।

রাস্তা ঘাট সব সময়ই স্যাঁতস্যাঁতে। মনে হয় এই বুঝি জল ঢেলে দিয়ে গেছে কেউ। এই সেপ্টেম্বরেও রাতে দুটো কম্বল গায়ে দিতে হয়। তবে দিনের বেলায় একটা হাতকাটা সোয়েটার হলেই যথেষ্ট।

গ্যাংটক ঘুরে দার্জিলিংয়ে এলে শহরটাকে আরও অনেক বেশি ঘিঞ্জি আর নোংরা লাগে। গ্যাংটকের সাজানো সব রাস্তা, ঝকঝকে মারুতি, মারুতি-ট্যাক্সি, হোটেল, ওয়াইন শপ, শপিং সেন্টার, কিউরিওর দোকান—মিলিয়ে সব কেমন যেন বিদেশ বিদেশ—খালি যা লাল মার্কেটের আশপাশটাই একটু ময়লা মতো। তেজপাতা, লবঙ্গ, পোস্ত, কাঁচা ছানা, বড় সড় ভোজালি আর নানান পাহাড়ি পাতা শেকড়-বাকড় নিয়ে বিক্রি করতে আসা মানুষের ভিড়। শহরের রাস্তায় প্রায় এক হাত অন্তর অন্তরই এইডস-এর ব্যাপারে চেতাবনী! ছবি। পোস্টার। কী কী কারণে এইডস হতে পারে তার বিবরণ। ইনজেকশনের ছুঁচ, কনডোম ব্যবহারের বিধি-বদ্ধতা, দর্ভপাণির সব পর পর মনে পড়ে গেল।

লাল মার্কেটের পাশেই হোটেল ডিকি। সিনেমা হল। সিনেমা হলের নাম 'দেংজং'। সামনে সোনা রঙের ড্রাগন আঁকা। হোটেল 'তাসি'র দিকটা আরও অনেক ঝকঝকে। সে দিক থেকে লাল মার্কেটের কাছাকাছি এলে খানিকটা নোংরা তো মনে হয়ই।

গ্যাংটক থেকে চব্বিশ কিলোমিটার দূরে রুমটেক মনস্ট্রি। তার ভেতর নাকি অনেক সোনা রাখা আছে।

বৌদ্ধ গুমফার সামনে অটোমেটিক রাইফেল আর অয়ারলেস সেট হাতে পাহারাদার খাকি উর্দি। সেই উর্দির মুখে কোনো ভাঁজ পড়ে না। লাল কাপড় পরা ন্যাড়া মাথারা, পায়ে বিদেশি স্নিকার, চপ্পল পরে দিব্যি ঘোরেফেরে। এঁরা সব শ্রমণ। এখানে ওখানে বড় বড় ধর্মচক্র। একবার দু বার তিন বার ঘুরিয়ে দেয়া যায়—'ওম মণিপদ্মে হুম' বলে। কচি লামা, মাঝবয়েসি লামা, বৃদ্ধ লামা। পা অব্দি লাল পোশাক। মাথা ন্যাড়া করার পর যতটুকু চুল গজায় সেটুকুই আছে তাদের মাথায়, দর্ভপাণি মনে করতে পারে। চ্যাপ্টা নাক। ছোট চোখ। পাশাপাশি দেখলেও একজনের থেকে অন্য জনকে চট করে আলাদা করা যায় না।

মনস্ট্রিতে সোনালী রঙের বিশাল বুদ্ধ। ঘরের ভেতর আবছা

অন্ধকারে তার চোখ চোখে পড়ে। শিরদাঁড়া টান করে বসা মূর্তির মুখে মোহনহাসি। কাচের আলমারির ভেতর নানা তাকে ছোট ছোট অনেক বুদ্ধ। দেয়ালে তিব্বতী ঘরানার বৌদ্ধ চিত্রকলা বেদির ওপর যে মেরুদাঁড়া টান করা বিরাট বুদ্ধমূর্তি, তা থেকে দু ধাপ নিচে তামা নয়ত কাঁসার বাটিতে—সার দেয়া বাটি, তার ভেতর জল। আরও নিচে বড় থালায় প্রণামীর টাকা। বাংলাদেশের নোট। ডলার। পাউন্ড। আরও অন্য দেশের কারেন্সি নোটও আছে সব আড়াআড়ি দাঁড় করান।

কোথাও কোনো শব্দ নেই। তিব্বত থেকে লামাদের আনা অনেক সোনা নাকি আছে এই রুমটেক-এ। তাই এত পাহারা, সতর্কতা।

গ্যাংটকের মূল শহর 'হোটেল তাসি' থেকে মারুতি ট্যাক্সিতে প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার। পথে ত্যাদং বাজারে। 'লারসন অ্যান্ড টুবরো'র কনস্ট্রাকশান। তার উল্টো দিকে মাত্র কয়েক বছরের পুরনো সরস্বতী মন্দির। দর্ভপাণি সব দেখতে পেল।

বুদ্ধের এই মূর্তির সামনে, কোথাও কোনো শব্দ নেই, প্রায়-অন্ধকার ঘরের পাশে শুধুই মারুতি ড্রাইভার বিনোদ গুরুং। তার গাড়ির নম্বর এস কে ০৪১৭৪৬। 'নরবুগং' হোটেলের সামনে থেকে গুরুং-এর গাড়ি ধরেছে দর্ভপাণি রায়। তখন দুপুর। আর এখন বিকেল নামছে।

দর্ভপাণি কি সেই দাঁতালটিকে দেখতে পেল?

মে মাসের সেই গরমে মেদিনীপুরের গোয়ালতোড়ে হাতির আক্রমণে তিন জনের মৃত্যু—এরকম খবর টেলিভিশন, খবরের কাগজ সবাই মিলে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিলে বনমন্ত্রী মহাকরণে গুণ্ডা হাতিটিকে মারার সিদ্ধান্তের কথা বলে দিলেন। গুলি করে মারা হবে দাঁতাল খুনিটিকে। চিফ লাইফ ওয়ার্ডেন সুবিমল রায়, সঙ্গে দর্ভপাণি। তাঁদের এই শিকার অভিযানে থাকবেন আরও একজন শিকারী। তাঁর হাতে '৩১৫ ম্যাগনাম রাইফেল।

আমি আমার হাতি-শিকার জীবন শুরু করেছিলাম সাইডলক '৪৭০ দোনলা রাইফেল দিয়ে। তার গায়ে ছিল ম্যান্টন কোম্পানির মার্কা। তখন ম্যান্টন কোম্পানি নিজেরা বন্দুক-রাইফেল বানায় না। বিলেতের অন্য কোনো কোম্পানিতে তৈরি করিয়ে নিজেদের নামের ছাপ দিয়ে নিত। তার আগে ছিল রিচার্ডসের '৪৫০/৪০০ বোরের দোনলা রাইফেল।

১৯৫৮-৫৯-এ গজদন্তের সের ছিল কুড়ি-পঁচিশ টাকা। এখন চোরাবাজারে এক কেজি গজদাঁতের জন্যে দিতে হয় তেইশ-চব্বিশ হাজার টাকার ওপর। তখন নিয়ম ছিল একটি দাঁতাল মারলে তার আঠার মাসের মধ্যে একটি মাকনাও মারতে হবে। দাঁতাল আর মাকনা—দাঁত সমেত আর দাঁতহীন এই দুই পুরুষ হাতির ভেতর হিসেবের ভারসাম্য রাখতেই এমন নিয়ম ছিল তখন। দর্পপাণি এসব যেন শোনাল নিজেকেই।

বিনোদ একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে। সে যেমন মারুতি ড্রাইভার, তেমনই খানিকটা গাইডও রুমটেক মনস্ট্রির।

বাইরে সন্ধে নামবে নামবে করছে। কোথাও কোনো শব্দ নেই।

মে মাসে সেই প্রবল গরমে কখন যে দাঁতালটি খুনে গুণ্ডা হয়ে উঠেছে, বন বিভাগের কর্মী, এমন কি গ্রামবাসীরাও তা ঠিক মতো টেরও পায় নি।

দাঁতাল নিহত বুধেশ্বর মাহাতর মুণ্ডুটি ধড় থেকে আলাদা করার পর পা দিয়ে থেঁতো করে। পরে তার বৌ পরি মাহাতর শরীরও ছিন্নভিন্ন। পরি দাঁতালের এই খুনি কাণ্ড দেখে হাউমাউ করেছিল। একেবারে জোড়াখুন। বুধেশ্বরের বয়েস ষাট। বৌ পরি প্রায় পঞ্চাশ।

এরপর মারা যায় ইন্দুকুড়ি গ্রামের হিমাংশু দুয়া। তার বয়েস তিরিশ।

বুধেশ্বর রাত দশটা নাগাদ অন্য একটি বাড়িতে টি ভি দেখে নিজের বাড়ি আসে। খাওয়া দাওয়া শেষ করে। গরম খুব। ঘরে

না শুয়ে খাটিয়া টেনে এনে বুধেশ্বর বাইরে শোয়।

সেই সময় হাতি আসে।

গোটা ব্যাপারটি চোখে দেখেছেন বুধেশ্বরের পিসিমা।

তাঁর মুখ থেকে দর্ভপাণিরা জানতে পারে দাঁতাল প্রথমে এসে বুধেশ্বরের ডান পায়ের ওপর নিজের পা তুলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে খাটিয়া।

ভয়ে চিৎকার করে বুধেশ্বর।

আর দাঁতাল সেই চিল-চিৎকারকে গ্রাহ্য না করে, একেবারেই আমল না দিয়ে আর একটি পা বুধেশ্বর মাহাতর মাথার বাঁ দিকে চাপিয়ে দেয়।

এখানেই শেষ হলো না। চলে যাওয়ার আগে তার পা মৃত বুধেশ্বর পেটের ওপর উঠে আসে। পেট ফাটে।

এলাকার লোকজন, বনকর্মীরা এই ঘটনার পর থেকেই বলতে শুরু করেন, হাতিটি খুনি।

বুধেশ্বরকে মেরে চলে যাওয়ার পথে এই হাতিটি ঐ গ্রামের একটি মোষের শিশু উপড়ে নেয়। মোষটি হয়ত আর বাঁচবেনা।

হাতিটি এতটাই খেপল কেন? খাবারের অভাব? নাকি তার আরও পাঁচটি বন্ধু তাকে ছেড়ে চলে গেছে বলে! দর্ভপাণি জানতে চাইল।

খাপড়িভাঙা, বড়নাকদোনা, বেতঝরিয়া, ছোটনাকদোনা, তিলাবনি—সব জায়গাতেই হাতির পাল। তারা বোরো ধান খেল, গম খেল, খেত তছনছ করল, মানুষ উত্ত্যক্ত হলো—কিন্তু নাহ:, তারা তো খুন হয় নি।

তাহলে কেন খুন করল এই হাতিটি?

গোটা পাঁচেক হাতির একটা দলকে কয়েকদিন আগে দেখা গেছে পাথরমারির জঙ্গলে। তার আগে এই সব হাতিরাই হয়ত কখনও হদহদি, কখনও আসনাগুলি, কখনও বা ভাঙাশোল গ্রামে ঢুকে পড়েছে। দর্ভপাণি সব জানতে পারল।

লোকাল রেঞ্জ অফিস থেকে লিটার লিটার ডিজেল আর মবিল দিয়ে মশাল বানিয়ে জ্বেলে রাখা হচ্ছে সারারাত। ভয় পাওয়া গ্রামবাসীরা যেখানে সেখানে, যখন তখন পটকা ফাটাচ্ছেন—হাতি আসুক, চায় না আসুক তবুও পটকার আওয়াজ করা চলছে। কি করব আমরা! দর্ভপাণি সব মন দিয়ে শুনছিল।

তারপর তো 'গুণ্ডা' খতমের সেই অভিযান।

শিকারী চঞ্চল সরকার, সহকারি রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়। ডার্টগান, ঘুমের ওষুধ ছিল টেকনিক্যাল অ্যাসিসটেন্ট সুব্রত পালচৌধুরীর কাছে।

আমি তো আর বন্দুকে হাত দেব না—নিজের মনে মনেই বলছিল দর্ভপাণি। তার পরনে খাকি শার্ট, প্যান্ট। পায়ে চামড়ার হান্টিং বুট। মাথায় টুপি।

ছুমগড়, গোয়ালতোড়, নয়াবসত—চারটি রেঞ্জের কয়েক হাজার মানুষের চিৎকার। সঙ্গে হুলা পার্টির হাঁকডাক। এই দলে পচা মাহাতও আছে।

দর্ভপাণি আর পারছে না। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে। সারা গায়ে ব্যথা। দু' চোখে ঘুম।

কারডাঙা, হাতিবাড়ি, মেটালা—সব গ্রামের মানুষই আতঙ্কে আছে—কখন কি যে হয়। এই বুঝি হাতি আসে।

হাতিয়া মোজায় নাংরেংডি গ্রামের কাছে সকাল দশটা নাগাদ হুই হুই করে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসেন রামকৃষ্ণ মাহাত—দর্ভপাণির ঠিক মতো মনে পড়ছিল না নাম। তাই হবে হয়ত। কিংবা অন্যকিছু—এই রুমটেক মনাস্ট্রির সমাহিত নৈঃশব্দ্যের ভেতর কত কি যে মনে পড়ে যায়।

বিনোদ গুরুং তাড়া দেয়। এবার ফেরা দরকার। আর দাঁড়ালে দেরি হয়ে যাবে। চারদিকে আলো কমে আসছে। পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে ফেরা মুশকিল হবে।

লাল মার্কেটে ছোট ছোট দোকানে নানান বিদেশি জিনিস।

যাঁরা বিক্রি করছেন, তাঁরা বেশির ভাগই মহিলা। অনেকেই তিব্বতী।

সন্ধেবেলা দূরে পাহাড়ের মাথায় আলো জ্বলে উঠলে যেন বা নিখুত প্রদীপের দেওয়ালী। হোটেলে নিজের ঘরে বিছানায় বসে হাতে 'ফায়ার বল' ব্র্যান্ডির একটা বড় পেগ নিয়ে দর্ভপাণি আবারও সেই দাঁতালটিকে দেখতে পায়। রক্তে 'ফায়ার বল'-এর তাপ মিশলে সেই দেয়ালীর আলোরা মাথার ভেতর নাচতে থাকে।

একটু একটু করে খেতে খেতে দর্ভপাণি দূরের আলোর দিকে তাকাতে তাকাতে নিজেও এক সময় এক টুকরো আলো হয়ে যায়।

আর এখন দার্জিলিংয়ের এই ম্যালে বিকেল হয়ে যাওয়ার পর নেপালী কবি ভানুভক্তের মুণ্ডুহীন মূর্তিটির পেছনে যে ছোট জে বি থাপা পার্ক, সেখানে ছবি তোলার উল্লাস। নানা কথা। ক্যামেরার শব্দ। ক্লিক-খচ্।

পার্কে ঢুকতে গেলে টিকিট কাটতে হয়। যেমন চিড়িয়াখানায়, হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে।

বিকেল নেমে আসা ম্যালে এখনও তেমন ভিড় নেই।

বসার বেঞ্চ ফাঁকাই আছে। দু তিনজন লোকাল ক্যামেরাম্যান কাঁধে ক্যামেরার বোঝাটি নিয়ে লুডো পেতে উবু হয়ে বসে 'ছক্কা' 'ছক্কা' বলে মাঝে মাঝেই চেঁচিয়ে উঠেছে।

সেদ্রিকে একটু তাকিয়ে থাকলেই বোঝা যাবে খেলার ফাঁকে ফাঁকে চলছে পয়সারও লেনদেন।

তেনজিং নোরগে রোডের দিকে যে হোটেল সকালে সেখান থেকে নজরে পড়ে পাহাড় আর পাহাড়। এমনকি গ্যাংটকের 'তাসি' হোটেলের মতো তারও জানলার কাচের ওপারে রাতে শুধুই যেন দেওয়ালীর আলো। কি তার রূপবাহার।

ম্যাল থেকে তেনজিং নোরগে রোড-এর দিকে যেতে গেলে ঘোড়ার আস্তাবল। ম্যালে প্লেজার রাইড-এর জন্যে রাখা আছে

অনেক ঘোড়া। তাদের জল, দানা দেয়ার চৌবাচ্চা। তারপর একটা ছোট, অন্ধকার ঘর মতো। তার ভেতর থেকে উপচে আসা ময়লা। কমলালেবু, কোয়াশের খোসা, বিস্কুটের প্যাকেট। ফ্রুটি, আলু চিপসের প্যাকেট, ব্যবহার করা স্যানিটারি ন্যাপকিন। খানিকটা ময়লা জল।

এটুকু পেরিয়ে এলেই বাঁদিকে সরকারি কাঁচা গাড্ডির দোকান। সরকারি লাইসেন্স পাওয়া দেশি মদের দোকান। তারপরই ভাতের হোটেল। পর পর দুটো। উল্টোদিকে পাথর আর ইটে বাঁধানো দেয়াল। তার গায়ে ফার্ন, পাহাড়ি লতা, রঙিন ফুল। নিচেই জলের কল।

জলের খুব টানাটানি এখন। সকাল আটটার মধ্যে হোটেলের জল চলে যায়। হোটেলের ব্যালকনিতে এই সেপ্টেম্বরে গোল গোল বোতাম সাইজের, কিংবা হঠাৎ দেখলে আঙুরও মনে হতে পারে, লাল লাল লঙ্কা ফলে আছে। তার পাশে সিজন ফ্লাওয়ার।

মরসুমি ফুলের রঙবাহারে চোখ আরাম পায়। পাশেই রাস্তা থেকে উঠে আসা লোমঅলা কুকুর, দেখলেই কোলে নিতে ইচ্ছে করে।

কাঁচা গাড্ডির দোকান পেরিয়ে হোটেলে আসতে গেলে রাস্তার ওপর যে গো-মাংসের দোকান, সেখানে ছাঁট আর ছিটকে আসা কোনো টুকরো বা হাড্ডির লোভে লোমঅলা গোটা তিনেক তাগড়া বড়সড় কুকুর লম্বা জিভ বার করে বসে থাকে। নয়ত পায়চারি করে। তিনটের রঙই বাদামীর দিকে। একটার পেট ফোলা। দেখলেই বোঝা যায় পোয়াতি। তারা মাঝে মাঝে দোকানের সামনে টাঙানো মাংসখণ্ডের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকে। কখনও হাত-পা ছড়িয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে রাস্তার ওপর।

তেনজিং নোরগে রোড-এর ওপর তরকারির দোকানে পাওয়া যায় শাদা বাঁধাকপি, কোয়াশ, আলু, গাজর, কাঁচালঙ্কা, বিনস, লম্বাটে চেহারার শাদা লাউ।

আজ দুপুরে হোটেলে কোয়াশ শাকের একটা ভাজি দিয়েছিল। মন্দ লাগে নি। দর্ভপাণির মনে পড়ল।

হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট যেতে রাস্তার বাঁ পাশে অজস্র মাথা উঁচু গাছের গায়ে গায়ে জড়ানো কোয়াশ লতা, পাতার চেহারা অনেকটা যেন বনধুঁধুল। পাতার সঙ্গে ফল। একটু শাদাটে। গায়ে নরম কাঁটা কাঁটা। হাত দিলে লাগে না। চেহারায় খানিকটা বুঝি পেঁপের সঙ্গে মেলে।

ফাইভ পয়েন্টস, সেভেন পয়েন্টস—ট্যুরিস্ট জিপ বা মারুতির এই চক্করে না গিয়ে দর্ভপাণি সকালে একা একা হেঁটেছিল চিড়িয়াখানার দিকে। সেখান থেকে হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট।

এ শহর তার আগেও জানা। জিমখানা ক্লাব ডান হাতে রেখে জওহর রোড দিয়ে হেঁটে আসতে আসতে রাজভবন। তারপর আরও কিছুটা হাঁটলে চিড়িয়াখানা। সেখানে দলবাঁধা নেকড়ে। গায়ে বড় বড় লোমঅলা কালো রঙের ইয়াক, শুধু পাতাই চিবোচ্ছে। চিবোচ্ছে।

কালো হিমালয়ান ভালুকটি পাঁচিলের ওপারে ঘোরাঘুরি করছিল। আহা, তার গায়ে যেন একখানা কালো কম্বল। একদা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে পাওয়া উস্সুরি বাঘের বংশধররা বিশাল বনের চারপাশে খাঁচার জালে বার বার আঙুল, থাবা, ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে দেখছিল। সঙ্গে হাড়-হিম করা চিৎকার।

কবে যেন পদ্মজা নাইডু উপহার পেয়েছিলেন একটি বাঘ, তার বংশবীজ দার্জিলিংয়ের চিড়িয়াখানার বাতাস গম্ভীর গর্জনে ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিচ্ছিল। সেই বাঘটি হয়ত শাদাই ছিল, স্মৃতি তেমনই বলে, আজ থেকে প্রায় বছর কুড়ি আগে এই চিড়িয়াখানাতেই তো সেই বাঘ আমি দেখেছি। দর্ভপাণি রায় মনে করতে চাইল।

একটু নিচের দিকে 'লামা' নামের সেই জন্তুটি, যা আমেরিকা থেকে আনানো হয়েছিল, অনেকটা যেন উটমুখো। লোক দেখলেই থুথু ছিটোয়। এখন আর 'লামা'-টিও নেই।

তখনও চন্দ্রা আর আমি এক সঙ্গে। দর্পপাণি মনে করছিল। দূরে সেই হলুদ-কালো ডোরাদার মৃত্যু কোনো শব্দ না করেই সাবধানে খাঁচার জালের ধারে চলে এলো। থাবা ছোঁয়াল তারের জালে। তারপর কোনো ভাবেই রক্তমাংসের স্বাদ না পেয়ে প্রবল আক্রোশে দূরে ছিটকে গিয়ে বড়, তাগড়া গাছটি জড়িয়ে, তার গুঁড়িতে নখ শান দিতে থাকল।

যে সিঁড়ি দিয়ে বাঘের খাঁচার কাছে উঠে এসেছিল দর্পপাণি, তার নিচে সরু প্যাসেজ। মাথার ওপর জাল। লোহার শিক। তার ভেতর হাঁউ হাঁউ হাঁউ করে চিৎকার করে যাচ্ছে এক বাঘিনী। সেই ডাকে, রক্ত জমে যায়। গাছে নখ ধার দেয় বাঘটি। আবারও চুপি দিয়ে খাঁচার পাশে আসে। চলে যায়। নিঃশব্দে আসে, ফিরে যায়। ওপরে বাঘ। নিচে বাঘিনী।

খানিকটা দূরে ভেতরে উঁকি ঝুঁকি দেয় খোকা-হিমলয়ান পাণ্ডা। ছোট বাক্স-খাঁচার ভেতর জাঙ্গল ক্যাট। খাঁচা ধরে নাড়ালেও তার ঘুম ভাঙে না। উল্টো দিকের খাঁচায় পায়চারি করে লেপার্ড। একটু পরে ফেজান্ট। তাদের ডানায় মেঘলা মতো আলো লেগে থাকে।

তেনজিং নোরগে রোড দিয়ে সোজা এলে কাঁচা গাড্ডির সরকারি দোকান, ঘোড়ার আস্তাবল বাঁয়ে রেখে কবি ভানুভক্তের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে বাঁ দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলেই চিড়িয়াখানার রাস্তা। ভানুভক্তের স্ট্যাচুর পেছনে সোজা হেঁটে গেলেই মহাকালের মন্দির। বেশ খানিকটা ওপরে উঠতে হবে। মন্দিরের লাগোয়া গাছে অনেক বাঁদর।

এই চিড়িয়াখানায় ধনেশ পাখিকে উঁকি মারতে দেখেছিলাম আজ থেকে উনিশ কুড়ি বছর আগে। তখন সঙ্গে চন্দ্রা। জীবন কত যে তাড়াতাড়ি চলে যায়। সবুজ গাছের ফাঁকে ধনেশের স্বাস্থ্যবান ঠোঁট। কুড়ি বছর হয়ে গেল।

ম্যালের ওপর একটু একটু করে বিকেল নেমে এলে সব বেঞ্চ ভর্তি

হয়ে যায়। বেঞ্চে বসা মানুষদের কাছে চা পৌঁছনোর জন্যে ব্যস্ত ছোকরাদের দেখা যায় আশেপাশেই। কাগজের কাপে গরম চা দু টাকা। তিন টাকায় গরম কফি।

টিবেটিয়ান লাসা আপসু বা অন্য কোনো জাতের কুকুর নিয়ে বেড়ানো মানুষদের দেখা যাবে এই বিকেলেও। অনেকটা সকালে দর্ভপাণি শীতের জামা-কাপড মুড়ে ম্যালে হাঁটতে এসে দেখেছে স্বাস্থ্যচর্চায় ব্যস্ত নানা বয়েসের ছেলেমেয়ে। ট্রাকস্যুট পরে দৌড়। জগিং। সঙ্গে ঝুবলি-ঝাবলি লোমঅলা আপসু।

কুকুর একটু দৌড়েই উক উক করে ডাকে। আর যাবে না। কিছুতেই যাবে না। তাকে এবার কোলে নিতে হবে।

মালিক যত ডাকে, কুকুর আর নড়ে না। জেদ নিয়ে বসে থাকে।

একটু পরে পিছিয়ে এসে কুকুরটিকে কোলে তুলে নিয়ে তারপর আবার ছুটতে হয়। কোলের ভেতর লাসা আপসু।

এসব দেখে বেশ মজা লাগে দর্ভপাণির। ম্যাল, মহাকাল মন্দির, জিমখানা ক্লাবের রাস্তায় তখন কতজন স্বাস্থ্য ফেরান, রাখতে চাওয়া লোকজন। তারা অনেকে তিব্বতী, কেউ কেউ বিদেশি। আছেন নেপালীরাও।

বিকেলের দিকে ম্যালে সিমেন্টের ছাউনির নিচে ইট-সিমেন্টের বেঞ্চে ভিড় বেশি। মাথার ওপর ছাদ। ঠাণ্ডা কম লাগে। পেছনে কুয়াশা আর মেঘ। দৌড় করান লাসা আপসু, পমেরিয়ান বা অন্য ব্রিডের লোমঅলা কুকুরদের নিয়ে কেউ কেউ এখানে এসে বসেন। হাতে চেন। কখনও এক গ্লাস কফি।

সন্ধে নেমে আসার আগে কলকাতার মাংকি টুপি, ফুল সোয়েটার, শাল কথা বলতে শুরু করে। ফাইভ পয়েন্টস, সেভেন পয়েন্টস।

জিপের ভাড়া। মারুতির ভাড়া। মিরিকের আর্টিফিসিয়াল লেক। লেক। টাইগার হিলে পৌঁছে যাওয়া গেল কত ভোরে। আদৌ সূর্য দেখা গেল কিনা। জিপ দেরিতে পৌঁছলে সূর্যের কাছে পৌঁছতেও দেরি। যত দেরি হবে, জিপ তত পেছনে। ফলে সেই দৃশ্যটি—আকাশ লাল হয়ে ওঠা—'ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং' মন্ত্র ছাড়াই—

এসব শুনতে শুনতে দর্ভপাণি চুপ করে সিমেন্টের ছাউনির নিচে বসে থাকে। একটু একটু করে অন্ধকার খেয়ে নিতে থাকে ম্যালকে। মাথার পেছনে কুয়াশা, মেঘ আরও ঘন হয়ে ওঠে। সেই 'ছক্কা' 'ছক্কা' বলা লুডো-পার্টি কখন যেন উঠে গেছে। তার বদলে এসে বসেছে মহাকাল মন্দিরে যাওয়ার রাস্তায় দেখা সেই দাড়ি চুল আর দুর্গন্ধ সমেত পাগল বা ভবঘুরেটি। যার নড়াচড়ার সঙ্গে গা-গোলান বদ গন্ধ হাওয়ায় ভাসে।

সন্ধে নামলেই একটা ছেঁড়া নোংরা কম্বলে গা ঢেকে পাগল এই ছাদের নিচে কোনো সিটে উঠে বসতে চাইবে। তারপর সুবিধে মতো জায়গা পেলেই শুয়ে পড়বে।

মিরিক, সন্দাখফু, গ্যাংটক, কার্সিয়াং, কালিম্পং—এসব নাম মুখে মুখে ঘোরে ম্যালের বাতাসে। কোথায় যাওয়া বা যাওয়া নয়। টয় ট্রেন রেগুলার চলে না। চললেও বড় ভিড়। সময় লাগে। অযথা সময় নষ্ট। তার চেয়ে কয়লার ইঞ্জিনে টানা হালকা নীল রঙের গাড়িতে বড় জোর কার্সিয়াং অব্দি যাওয়া। ফিরে আসা। দিব্যি টয় ট্রেন চাপাও হয়ে গেল।

লোকজন সরু লাইনে শাদা বালি ছড়াচ্ছে সব সময়। লম্বাটে দা দিয়ে পথের ধারের ফার্ন, ঝোপ-জঙ্গল সাফাই। চন্দ্রাকে নিয়ে সেবার তো টয় ট্রেনেই গেলাম দার্জিলিং, এন. জি. পি. থেকে। দর্ভপাণি মনে করতে পারল। সে তো উনিশ-কুড়ি বছর হবে প্রায়। শুকনা, টুং-সোনাদা-ঘুম। বাতাসিয়া লুপ। দার্জিলিংয়ে পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধে। পথে মাউথ অরগ্যান বাজান পাহাড়ি কিশোর।

ছুটতে ছুটতে বাঁকের মুখে টয় ট্রেন ধরে নিচ্ছে।

ম্যালের ওপর অন্ধকার নেমেছে। ঠিক ছটা-সাড়ে ছটায় এখানে সব দোকান বন্ধ হয়ে যাবে। রাস্তায় কাঁচা গাড্ডি খাওয়া কেউ কেউ একটু গায়ে পড়া হয়ে সামান্য বিরক্ত করতে পারে।

দর্ভপাণি হোটেলে ফিরছে। প্যান্টের দু পকেটে হাত। গ্যাংটক থেকে কেনা বিদেশি জ্যাকেটের কলার তোলা।

ম্যাল পেরতেই ঘোড়ার আড্ডা। সেখানে এখন ঘোড়াঅলা, ঘোড়ারা প্রায় কেউই নেই। শুধু রয়ে গেছে সেই কালো ঘোড়াটি, তার সামনের ডান পা সামান্য খোঁড়া। একটু যেন নেংচে হাঁটে। মুখের লাগাম, পিঠের সাজ নেই। হয়ত বাতিল।

বিকেলে ম্যালে যাওয়ার সময় দর্ভপাণি দেখেছিল রাস্তায় জলের কলের লাইনে যখন হুড়োপাড়া ভিড়, সবাই শাদা-পলিথিন জেরিক্যান, অ্যালুমিনিয়মের পাত্র, প্লাসটিকের বালতি দিয়ে নিচু কল থেকে জল ধরতে ব্যস্ত, বিশেষ করে মেয়েরা, তবু তাদের বোঁচা নাক, ছোট ছোখে হাসির ঢেউ, বেশির ভাগেরই সাজের খুব বাহার। এসব এখন মনে পড়ল দর্ভপাণির। চন্দ্রা এইসব সাজগোজ করা মেয়েদের দেখে বলত, 'সাজনতারা'—সেই যেবার তারা দুজনে একসঙ্গে এসেছিল, তাদের পাশের এই পায়ে ব্যথা পাওয়া, নয়তো খুঁতো হয়ে যাওয়া ঘোড়াটি, ইট আর পাথরের দেয়াল থেকে বুনো ফার্ন ছিঁড়ে খাচ্ছে।

কলের পাশেই রাস্তার ওপর বিড়ি-সিগারেট। পাশে তেলেভাজা ডিম-পাউরুটি, এগরোল, ইয়াক—চমরি গাইয়ের দুধ জমানো সুরফি। এখানকার মানুষ বলেন ছুরফি।

মেয়েরা খুব গালে রাখে সুরফি। চৌকো এক টুকরো এক টাকা। অনেকক্ষণ, তা ঘণ্টা দুই পর তো বটেই, গালে রাখলে তা থেকে খানিকটা খানিকটা যেন বাসি গুঁড়ো দুধের স্বাদ মিশে যায় জিভে।

সিগারেট দেশালাই কেনার সঙ্গে সঙ্গে গোটা দুই সুরফিও কিনল দর্ভপাণি। একটা নিয়ে রাখল গালের পাশে। তারপর

সিগারেট ধরানোর সময় আড়চোখে দেখতে পেল সেই মেয়েরা, জল তুলতে রাস্তার বসে থাকা মেয়েরা হাসছে।

সেদিকে তেমন মন না দিয়ে দর্ভপাণি রায় মনে করতে চাইল দুপুরে আমি কি দিয়ে ভাত খেয়েছিলাম? ভাত, মুসুর ডাল, কোয়াশের তরকারি আলু দিয়ে। কোয়াশের স্বাদ অনেকটা পেঁপে আর লাউয়ের মাঝামাঝি। কোয়াশ শাক ভাজা—তা বেশ খেতে, অনেকটা যেন লাল শাক। আর কি ছিল? কি ছিল? ও হ্যাঁ, চিকেন কারি।

সেই মেয়েরা শব্দ না করে হেসে যাচ্ছে! সে কি আমাকে দেখে? অনেক সময় প্যাণ্টের জিপার খোলা থাকে, সেই দেখেই কি—আলতো হাতে দেখে নিল দর্ভপাণি—নাহ্, টানা আছে। তাহলে হয়ত এমনি এমনিই হাসি, কোনো কারণ ছাড়াই।

বিকেলের রোদে ঘোড়ার পিঠের কালো চামড়া জ্বল জ্বল করে উঠছে। সেখানে কোনো বসার জায়গা নেই। মুখে লাগামও না। শুধু নিষ্ঠুর শব্দ শোনা যাচ্ছে ফার্ন ছেঁড়ার।

ফেরার সময় কাঁচা গাড্ডির দোকানের আগে সেই ময়লা-আবর্জনার পাশে ঘোড়াটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল দর্ভপাণি। একা একা ঘাড় নিচু করে কি জানি কি খুঁজছে।

কমলালেবু, মুসাম্বির খোসা, তরকারির খোলা, কেয়ারব্রি-র শূন্য প্যাকেট। ঠাণ্ডা বাতাসে কেমন যেন ঘুলিয়ে ওঠা গন্ধ। ঘোড়াটি খাচ্ছে। এক মনে খাচ্ছে।

কাঁচা গাড্ডির দোকানের সামনে যে ইলেকট্রনিক বাল্ব, তাতে তেমন জোর নেই। দোকানের সামনে কাচের শো-কেসে নুডলসের প্যাকেট, নানা রঙের সসের বোতল। ভিনিগার। ভেতরে আবছা অন্ধকার।

এই তো আমার হোটেলে ফেরার রাস্তা, তেনজিং নোরগে মার্গ, ম্যাল থেকে একটু দূরে। দোকানের ভেতর থেকে মাতালের কথার টুকরো বাইরে আছড়ে পড়ছিল। পাশের চিনা খাবারের দোকানটিতে কোনো লোক নেই। শুধু দরজায় দাঁড়ান এক নারী। শাদায়-

কালোয় একটি বেশ বড় লোমঅলা কুকুর তার পাশে।

ঘোড়াটি আপন মনে কত কি হাবিজাবি খেয়ে যাচ্ছে। আর তখন আবারও মেদিনীপুরের গোয়ালতোড়ের ইন্দুকুড়ির জঙ্গলে গুলি করা দাঁতালটিকে মনে পড়ে গেল দর্জিপাগির।

গুলি খেয়ে পড়ে যাওয়া হাতিটিকে দেখে গ্রামের লোকেরা কেউ কেউ বলল, দাঁতালের শিরদাঁড়া বড় উঁচু। দেখেই বোঝা যাচ্ছে অনেকদিন ধরে না খেতে পেয়ে পেয়ে বেচারা রোগা হয়ে গেছে।

দলমার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা ষাট বছরের দাঁতাল। শিকারির বন্দুকের ঠিক পঁচিশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে।

বাংলা দৈনিকে খবরটি এভাবে ছাপা হয়েছিল—

'স্টাফ রিপোর্টার: মেদিনীপুর, একদিকে ২০/২২টি গ্রামের হাজার হাজার মানুষ, বন বিভাগের তাবড় লোকজন, দক্ষ দুই শিকারি, অন্যদিকে দূর দলমা পাহাড় থেকে আসা খাদ্যসন্ধানী এক হাতি—অসম এক লড়াই আজ সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে শেষ হয়ে গেল।

'তিন জনকে মেরে সরকারিভাবে 'গুণ্ডা' হয়ে-যাওয়া হাতি প্রায় স্বেচ্ছায় শিকারিদের বন্দুকের সামনে এক অমর্যাদাকর মৃত্যু বরণ করে নিল। সাতটা গুলি খেয়ে লুটিয়ে-পড়া হাতির পাশে কয়েকশো গ্রামবাসী যখন আনন্দ করছেন তখন অভিজ্ঞ এক বনকর্মী ৬০ বছরের হাতিটিকে দেখে বললেন, 'শিরদাঁড়াটা বড় উঁচু। দেখেই বোঝা যাচ্ছে অনেক দিন ধরে না খেতে পেয়ে বেচারা রোগা হয়ে গিয়েছিল।'

'ক্রমাগত তাড়া খেয়ে ক্লান্ত ও বিভ্রান্ত হাতিটি আজ সকালে যখন শিকারিদের বন্দুকের সামনে এসে দাঁড়াল, চঞ্চল সরকার ও রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় তখন ঘণ্টা তিনেকের ঘোরাঘুরির পরে জঙ্গলের মধ্যেই খোলা জায়গায় বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময় প্রায় বিনা ভূমিকাতেই ৬০ বছর বয়সী হাতিটি তাঁদের ২৫ ফুট দূরত্বে এসে দাঁড়াল। আকস্মিকতার ধাক্কা কাটিয়ে ডাবল ব্যারেল রাইফেল

তুলে চঞ্চল সরকার প্রথমে গুলি-করলেন। বুলেট গিয়ে বিঁধল হাতিটির শিরদাঁড়ার কাছে। গুলি খেয়ে স্বভাবত ক্রুদ্ধ হাতিটি ঘুরে দাঁড়িয়ে বাঁচার শেষ চেষ্টা হিসাবে কয়েক ফুট খেয়ে এল শিকারিদের দিকে।

'এবার রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় তাঁর '৪৫৮ ম্যাগনাম রাইফেল থেকে গুলি করলেন। গুলি লাগল বাঁ চোখের অল্প নিচে। সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চলবাবুর বন্দুক আবারও গর্জে উঠল। পর পর তিনটি গুলি খেয়ে হাতিটি লুটিয়ে পড়ল। সেখানেই না থেমে দুই শিকারি পর পর আরও চারটি গুলি ছুঁড়ে নিশ্চিন্ত হলেন, 'গুণ্ডা' হাতিটি এবার সত্যিই মরেছে। একটু দূরে অপেক্ষমান গ্রামবাসীরা এরপরেই চিৎকার করতে করতে ছুটে এলেন। শুরু হয়ে গেল মৃত হাতিটিকে ঘিরে আমন্দোৎসব।

'এই খেতে না-পাওয়া হাতিটিই গত এক সপ্তাহ ধরে খাবারের সন্ধানে গোয়ালতোড় ও চারপাশের গ্রামে গ্রামে হানা দিতে শুরু করেছিল। মানুষের তাড়া খেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে মাঝেমধ্যেই পাল্টা হামলা চালিয়েছিল গ্রামবাসীদের উপর। হাতির হামলায় তিন জনের মৃত্যুও হয়েছে। এরপরই হাতিটিকে 'গুণ্ডা' বলে ঘোষণা করে বনবিভাগ মারার নির্দেশ দেয়।

'গতকাল সারাদিন ধরে কলকাতার দুই শিকারি ও হাজার হাজার গ্রামবাসী জঙ্গলে ঘুরেও হাতিটির নাগাল পাননি। মাঝে মাঝে উড়ো খবর এলেও কেউই নিশ্চিত করে হাতিটির হদিশ দিতে পারেননি। তবু হাতিটি যাতে গোয়ালতোড় রেঞ্জের জঙ্গল ছেড়ে পালাতে না পারে সেজন্য বনের চারধারে মশাল জ্বেলে গ্রামবাসীরা পাহারা দিয়েছেন, ক্যানেস্তারা পিটিয়ে গিয়েছেন রাতভর। আজ ভোর থেকে নতুন উদ্যমে শুরু হয় হাতির খোঁজে জঙ্গলে হুলা পার্টির 'খেদা' অভিযান। সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ প্রথম খবর এল, হাতিটি টাঙ্গাসোলের জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে। হুমগড় রেঞ্জেই এক ফালি বন হল টাঙ্গাসোল। গোয়ালতোড় রেঞ্জের পাশেই

হুম্রগড়। তখনই খোঁজখবর নিয়ে শিকারিরা জিপে চড়ে রওনা দিলেন টাঙ্গাসোলের দিকে। জঙ্গলের মধ্যে ক্যানালের ধার দিয়ে মোরাম বিছানো উঁচুনিচু রাস্তা ধরে আটটি গাড়ির কনভয় শিকারি, বনবিভাগের কর্তাব্যক্তি ও সাংবাদিকদের নিয়ে এগোল। গোটা কনভয়ের নেতৃত্বে ছিলেন কনজারভেটর অব ফরেস্ট অশোক গুহরায়। মাইল দুয়েক চলার পরেই কনভয় থেমে গেল। বনকর্মী সুজয়লাল দে হাতে ওয়াকিটকি নিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন আরও কিছুটা পথ। সেখানে আগে থেকে মোতায়েন করা এক বনকর্মী কনভয় থামিয়ে ইশারায় বললেন, হাতি কাছে পিঠেই আছে। সেখানে জঙ্গলের মধ্যে একটু খোঁজাখুঁজি করে হাতির পায়ের ছাপ দেখতে না পেয়ে আবার এগোলেন শিকারিরা। প্রায় ১০টা নাগাদ ওয়াকিটকিতে সুজয়বাবুর উত্তেজিত গলা ভেসে এল—হাতিটিকে দেখতে পেয়েছি, ইন্দুকুড়ি গ্রামের পাশেই বড়জঙ্গলে জঙ্গলে ঘিরে রেখেছি। কনভয় ছুটল সেদিকে।

'ইন্দকুড়ি গ্রামে গিয়ে কনভয় যখন থামল তখন ঘড়িতে সকাল ১০টা ১০ মিনিট। গাড়ি গ্রামের মধ্যে রেখে শিকারিরা এবার পায়ে হেঁটে জঙ্গলের দিকে রওনা দিলেন। জঙ্গলে ঢোকার মুখে শিকারিদের পথ আগলে দাঁড়ালেন এক বিধবা মহিলা, সঙ্গে একটি ছয়-সাত বছরের ন্যাড়ামাথা ছেলে।

'বুক চাপড়ে কাঁদতে কাঁদতে ঐ মহিলা জানালেন, এই হাতিই তাঁকে বিধবা করেছে, তাঁর ছেলেকে করেছে পিতৃহীন। ছেলেকে বাঁচাতেই শিকারিদের কাছে তাঁর আর্জি, 'হাতিকে না মেরে ফিরে এস না বাবারা।'

'শিকারিদের অনুসরণ করে কয়েক'শ গ্রামবাসীও জঙ্গলের দিকে এগোলেন। জঙ্গলে ঢুকেই বনকর্তাদের সঙ্গে শিকারিদের একপ্রস্থ তর্কাতর্কি শুরু হল। বনকর্তাদের প্রস্তাব, আগে হাতিটিকে ঘুমপাড়ানি গুলি ছুঁড়ে পরীক্ষা করা হোক, এটাই সেই গুণ্ডা

হাতি কি না। তারপরে মারা হোক।
'শিকারিদের বক্তব্য, ঘুমন্ত হাতিকে মারা কোনো শিকারির কাজ নয়।
'শেষ পর্যন্ত গুলি করে মারাই' সাব্যস্ত হল। জঙ্গলের মধ্যে কিছুটা খোঁজাখুঁজির পরেও হাতির দেখা মিলল না। দেখা মিলল বনকর্মী সুজয়বাবুর। তিনি জানালেন, হাতি আবার উধাও।
'শিকারিরা অগত্যা একটু খোলা জায়গা দেখে গাছতলায় বসে পড়লেন। গ্রামবাসীদের নিয়ে তৈরি হুলাপার্টি তখনও জঙ্গলে খেদা চালিয়ে যাচ্ছিল। যার জন্য এত উদ্যোগ আয়োজন, সেই হাতিটি অবশ্য একটু পরে শিকারিদের সামনে খোলা জায়গায় দেখা দিল। সম্ভবত হুলাপার্টির হইহট্টগোলে বিভ্রান্ত হয়েই ক্লান্ত বিধ্বস্ত হাতিটি ছুটতে ছুটতে এসে পড়ল শিকারিদের বন্দুকের আওতায়, খোলা জায়গায়। মারার পরে গ্রামবাসীদের অভিনন্দন-আপ্লুত শিকারি চঞ্চল সরকার বললেন, তাঁর শিকার-জীবনের অভিজ্ঞতায় এটি ছিল অন্যতম সহজ শিকার। 'হাতিটিকে প্রায় আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল।'
'যেখানে গুলি খেয়ে হাতিটি পড়েছিল, তার পাশেই গর্ত খুঁড়ে ৯ ফুট ৩ ইঞ্চি হাতিটিকে মাটি চাপা দিয়ে সৎকারের ব্যবস্থা করেন বনকর্মীরা। তার আগে অবশ্য হাতিটির দেড় ফুট লম্বা দুটি দাঁত কেটে নেওয়া হয়। সৎকারের আয়োজন দেখতে বড়নাকদোনা গ্রামের বিজয় ঘোষ কিছুটা আফসোসের সুরে বললেন, 'জঙ্গলের মধ্যেই হাতির খাবারের যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকলে এভাবে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেঘোরে প্রাণ দিতে হত না। আমরাও ধনেপ্রাণে বেঁচে যেতাম।'
'শিকারিদের সামনে রেখে গ্রামবাসীরা বিজয়মিছিল করে গ্রামের পথ ধরলেন দুপুরেই। যেখানে গাড়ি রাখা ছিল সেখানে পৌঁছে বনকর্তারা ও শিকারি দু'জন আবার জিপে উঠলেন। কনভয়

টাঙ্গাসোল ছাড়িয়ে কিছুটা এগোতেই রাস্তা আটকে দাঁড়াল একদল গ্রামবাসী। উত্তেজিত এই গ্রামবাসীদের দাবি, তাঁরা মাইলখানেক দূরে বিলাবলি গ্রামের বাসিন্দা। সেখানে আজকেই হাতির তাণ্ডবে ঘরবাড়ি ভেঙেছে, খেতের ফসল লণ্ডভণ্ড হয়েছে। একটা 'গুণ্ডা' হাতি নয়, এবার পাঁচ পাঁচটা হাতির একটি দল।'

আর একটি দৈনিক এর পরদিন ছাপল—

'স্টাফ রিপোর্টার, মেদিনীপুর, ৩ জুন: গোয়ালতোড়ের ইন্দকুড়ি জঙ্গলে বৃহস্পতিবার দাঁতাল হাতিটিকে শিকারিরা গুলি করে মারার পরও হুমগড় রেঞ্জের বিভিন্ন গ্রামের মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফেরেনি। কারণ গ্রামবাসীদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা, যাকে গুলি করে মারা হল সেই উদ্দাম খুনে হাতি এটি নয়। অন্য একটি নিরীহ হাতিকে মারা হয়েছে।

হাতির তাণ্ডবে অভ্যস্ত প্রবীণ গ্রামবাসীদের কেউ কেউ মনে করেন হিংস্র উন্মত্ত হাতি কখনও চুপচাপ দাঁড়িয়ে একের পর এক গুলি হজম করে না। প্রথম গুলিটি শরীরে বিদ্ধ হলেই দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রচণ্ড দাপাদাপি করে ওঠে পাগলা হাতি। তার চিৎকারে গ্রামের মানুষ তটস্থ হয়ে ওঠে। কিন্তু এক্ষেত্রে তার কিছুই হয়নি। গ্রামবাসীদের অনেকে মনে করতে শুরু করেছে, আসল খুনে হাতিটি এখনও গভীর জঙ্গলে ঘাপটি মেরে রয়েছে। তবে গ্রামবাসীদের এই বিশ্বাসকে আদৌ আমল দিতে চান না বনকর্মীরা। তাঁদের বক্তব্য, খুনে হাতিটি বেশ কয়েকদিন ধরেই ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিল। কিছুটা ক্লান্তও। তাই এই ব্যতিক্রম। এদিকে, হাতির দলের তাণ্ডবে এখনও হুমগড় রেঞ্জের আসনগুলি, ডাঙাসোল, পাথরমারি, গোয়ালতোড় প্রভৃতি এলাকার মানুষ ভয়ে তটস্থ হয়ে রয়েছে।

'শির্সা প্রাইমারি স্কুলের মাস্টারমশাই শীতল পাত্র জানালেন, বৃহস্পতিবার রাতেই তিনটি হাতির একটি দল তাঁর ধানের মরাই তছনছ করে দিয়েছে। মরাই থেকে প্রায় ২৫ মণ ধান খেয়ে

পালিয়েছে এই হাতির দল। গত কয়েকদিন ধরেই আসনগুলি
গ্রামে রবিশস্য খেয়ে পালাচ্ছে অন্য একদল হাতি। মাঠের
তরমুজ, ফুটি, তিসি খেয়ে গেছে। ভেঙেছে কয়েকটি মাটির
বাড়ি। অন্যদিকে হুমগড় রেঞ্জের হাতির তাণ্ডব নিয়ে যে হইচই
শুরু হয়েছে তাতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন গোয়ালতোড় রেঞ্জের
বিট অফিসার স্বপনকুমার সামন্ত। তিনি বলেন, ১৯৮৬ সাল
থেকেই দলমা থেকে আসা এই হাতির দলের স্থায়ী ঠিকানা
হুমগড়, গোয়ালতোড়, গড়বেতা, লালগড় ও শালবনির গভীর
জঙ্গল। এইসব এলাকায় শাল ও ল্যাটা গাছের গভীর
জঙ্গলেই এরা শান্তিতে বসবাস করছে। কিন্তু একশ্রেণীর
গ্রামবাসী হাতি তাড়ানোর নামে নানাভাবে বিরক্ত করছে
নিরীহ হাতির দলকে। তীরের আগায় আগুন লাগিয়ে ছুঁড়ে
মারা হচ্ছে হাতির গায়ে। অন্যান্য ধারালো অস্ত্র দিয়েও আঘাত
করা হচ্ছে হাতিদের।

'ফলে, মাঝে মাঝেই তারা উদভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তছনছ করে
শস্য ক্ষেত। তাই এখন থেকে গ্রামবাসীদের নিরাপত্তার
পাশাপাশি হাতিরা যাতে শান্তিতে বসবাস করতে পারে সেদিকে
নজর রাখা হবে।

'এদিকে, গতকাল যে হাতিটিকে শিকারিরা গুলি করে মারলেন,
তার দাঁত দুটি বেশ পুষ্ট। দেড় ফুট করে লম্বা। ওজন হবে
কম করে ১৫ কিলোগ্রাম। এখন হাতির দাঁতের বাজার দর
প্রতি কিলোগ্রাম ২৪ হাজার টাকা। রীতি অনুযায়ী শিকারিরা
তাঁদের পারিশ্রমিক হিসেবে একটি হাতির দাঁত পান।'

নেমে আসা অন্ধকারে সেই ঘোড়াটি একা একা মাথা নিচু করে
কি যেন খাচ্ছে। তার সামনের পায়ে চোট। দর্পপাণি আবারও
গোয়ালতোড়ের জঙ্গলের সেই দাঁতালকে দেখতে পাচ্ছিল। বর্ষার

মেঘের রঙ গায়ে। সকালের আলো-ছায়ায় শিকারির '৪৫৮ ম্যাগনাম রাইফেলের সামনে দাঁড়ান গজরাজ। বড় দাঁত। শুঁড়। ছোট ছোট চোখের কোণে কি যেন এক অস্থিরতা। দাঁতাল শুঁড় নাড়াল। বাতাসে বন্দুকের শব্দ। পর পর। পর পর।

বারুদের গন্ধ। ধোঁয়া। তারপর কি এক তীক্ষ্ণ চিৎকার। মরার আগে বোধহয় এমনটিই হয়ে থাকে।

ঘোড়াটি খাবার খেতে খেতে একবার মুখ তুলল। বোধহয় তাকাল দর্ভপাণির দিকে। তারপর আবারও মাথা নামাল।

হোটেলে ফিরে রুম সার্ভিসের খাবার আসে। সাজান সেই খাবার খেয়ে নিয়ে ড্রিংকস নিয়ে বসা। গোটা দুই পেগ নেওয়ার পর শুয়ে পড়া।

ঘরের ভেতর দেয়ালে রঙিন মথ এসে ডানা ছড়িয়ে বসে। একটা দুটো তিনটে। তারপর রাত আরও বেড়ে গেলে কাচের জানলার ওপারে অনেকটা কুয়াশা আর মেঘ পেরিয়ে কালো কালো পাহাড়ের মাথায় মাথায় গায়ে পিঠে আলোর ফুটকি জ্বলে উঠলে, গোটা আকাশটাই একটু একটু করে যেন আলো হয়ে ওঠে। তারপর কোনো রহস্য, নয়ত খুনের উপন্যাসে যেমন হয়, মেঘ-কুয়াশা ঘিরে ধরে সবটুকু। একটু ঝিমঝিমে হাতে ভারি, বাহারি পর্দা জানলার কাচের ওপর টেনে দেয়ার আগে দর্ভপাণি দেখতে পায় কাচের ওপারে অনেক মথ। নানা রঙের। তারা যেন স্টিকার হয়েই আটকে থাকে। রাত আরও খানিকটা বেড়ে গেলে কোনো থ্রিলারের পাতা থেকে ক্লান্ত হয়ে আসা চোখ তুলে আলো নেভানোর কথা ভাবা দর্ভপাণি কাচের জানলায় আলতো টকটক শব্দ শুনলে, ওয়েটার কেন এখন এদিকে আসবে—এমন ভাবনায় পর্দা সরিয়ে দিলে ম্যালের সেই নিঃসঙ্গ একটু খুঁড়িয়ে চলা ঘোড়াটিকে দেখতে পায়। আর দেখে অবাক হয়ে ভাবতে থাকে, দোতলার এই হাইটে এ ঘোড়া কেমন করে পৌঁছল।

বাইরে শীত বাড়ছে। ঘোড়ার নাক থেকে উড়ে আসা গরম নিশ্বাস

জানলার কাচে কি এক ছায়ার বিভ্রম তৈরি করে। মনে হয় ফোসকা ফুটে ওঠে কাচের গায়ে। ক্লান্ত চোখ, কান, ঘাড়ে কেশরের আভাস—শুধু ঘোড়ার মুণ্ডুটুকুই যা চোখে পড়ে। যেমন 'হর্স হেড' নামে একটি দেশলাই বাক্সে ছবির অশ্বমুণ্ড।

ঘোড়াটি আবারও কাচের জানলায় বাইরে থেকে টুক টুক টুক টুক করে টোকা দেয়। তার কি জানি কি বলার আছে। তারপর আরও কিছুক্ষণ কেটে গেলে এক সময় এ ঘোড়াকে ডানা মেলে সত্যি সত্যি আকাশে উড়ে যেতে দেখে দর্ভপাণি।

সেই মেঘলা কুয়াশার ভেতর পক্ষিরাজ ডানা ঝাপটে উড়ে গেলে হাঁ হয়ে থাকতে হয় খানিকক্ষণ। চাপা একটা ঘোড়া ঘোড়া গন্ধও ফুটে ওঠে বাতাসে। তারপর সেই ডানামেলা ঘোড়া দূর অন্ধকারে মিলিয়ে গেলে ঘরের ভেতর একজন আস্ত মানুষ পা থেকে মাথা অব্দি ছায়া হয়ে ভেসে উঠতে পারে এমন আয়নায় সেই গুলি লাগা দাঁতালকে দেখে দর্ভপাণি। মাথার ওপর শুঁড় তোলা রক্তাক্ত দাঁতাল। চোখের কোল থেকে গড়িয়ে পড়ে জলের ধারা।

আমি তোমায় গুলি করিনি, গুলি করিনি তোমায়—বিশ্বাস কর—আমি শুধুই শিকারিদের সঙ্গে ছিলাম। নিজেকে নিজে এসব কথা শোনালেও দর্ভপাণি কাচে নিজের ছায়া দেখতে পেল না। সেখানে সেই দাঁতাল। চার পায়ের ওপর দাঁড়ান। তার তীক্ষ্ণকণ্ঠে বনের আক্রোশ। শিরদাঁড়ায় গুলি লেগেছে। পরপর সাতটা।

আমি খেতে পাইনি। খাবার কমে গেছে। আমাদের খাবার কমে গেছে। আমরা খেতে পাই না।

থ্রিলার খসে পড়েছে হাত থেকে। দেয়ালে আলোর কাছাকাছি ডানা ছড়ানো রঙিন, চিত্র-বিচিত্র মথেরা তেমনই স্থির। জানলার কাচের বাইরের দিকে অনেকগুলো মথ, আলাদা আলাদা রঙের। যদিও সেখানে এখন ভারি, বাহারি পর্দা টানা। হয়ত সেটুকু আড়াল সরিয়ে দিয়ে আবারও ফুটে উঠবে ঘোড়ার নাক থেকে উড়ে আসা শ্বাসের ছ্যাঁকা-দাগ। যা কুয়াশায় এখনও মুছে যায়নি।

আমাদের জন্যে জঙ্গল নেই। কলাবাগান নেই। তাই মাঠের ধান—

বিছানায় নিজের গায়ে ডবল কম্বল আরও ভালো করে টেনে নিয়ে দর্পপাণি বলে যাচ্ছে, তাই বলে দোকানের চোলাই লুট করে খেয়ে মাতাল হয়ে—

কি করব, খিদে পায়। নেশা করতে ইচ্ছে করে। মজা লাগে নেশা করলে। আয়নায় ভেসে ওঠা সেই দাঁতাল উত্তর দিল। তারপরই বলল, তোমরা সবাই খুনি। সবাই মিলে আমায় গুলি করলে। তবে সত্যি বলতে কি আমারও তো আর বাঁচার ইচ্ছে তেমন করে ছিল না—

সাত সাতটা গুলি খেয়ে মাটিতে আছড়ে পড়া হাতিটিকে দেখতে পেল দর্পপাণি। আয়না জুড়ে সেই বনভূমির থেঁতো হয়ে যাওয়া ঘাস, ডালপালার পাশে, ওপরে গজপতি। চোখের কোণে জলের ধারা। তখনই অনেক দূরে কলকাতায় কাগজের অফিসের কোনো সাংবাদিক তার খবরটি এভাবে লিখে ফেলতে পারে—

'আগামী কাল বুধবার সূর্যোদয়ের আগেই শুরু হচ্ছে স্মরণকালের মধ্যে এ রাজ্যের বৃহত্তম হাতি তাড়ানো অভিযান। সব প্রস্তুতি শেষ হওয়ার পরেও যাঁরা এই অভিযানে অংশ নেবেন, সেই বনকর্মীদেরই একটা বড় অংশ মনে করছেন, এই অভিযানের ফলে হাতিদের হটানো তো যাবেই না, বরং তারা আরও খেপে যাবে। এই দোনামোনার মধ্যেই বছরের পর বছর ব্যর্থ হওয়ার পর এবার বন বিভাগের কর্তারা স্থির করেছেন, 'অপারেশন এলিফ্যান্ট ড্রাইভ' শুরু করে তার শেষ দেখা হবে। যাদের নিয়ে এত ভাবনা-চিন্তা, সেই বুনো হাতির দল অন্যদিকে নির্বিকারে মেদিনীপুর শহরের আশেপাশে পৌঁছে বন ধ্বংস করে চলেছে।

'তাদের স্বভূমিতে (বিহারের দলমা পাহাড়ে) ফিরিয়ে দিতে হলে বন বিভাগের এই সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপানো সংগ্রামে উচ্চপদস্থ অফিসারকুল; হাতি খেদানোর দলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নামাতে হবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 'কুনকি' হাতিদের। তাদের

রাত পোহাবার আগেই অন্ধকার থাকতে থাকতে কাজে নামাতে হবে। ২৫ বছরের লক্ষ্মীবালা তাই পেট ভরাতে ব্যস্ত সামনে স্তূপাকার কলাগাছ, কাঁঠালপাতা দিয়ে। এটা বৈকালিক খাবার, মুখ বদলানো। উর্বশী, রাজকুমারীরও কোনওদিকে দৃকপাত নেই। আরাবাড়ি জঙ্গলমহলের মিরগ বিট অফিসের বাঁদিকের জমিতে গাছের গুঁড়িতে পায়ে শিকল বাঁধা অবস্থায় রয়েছে সুন্দরীরা। 'সুন্দরী' মাহুতের কাছে। ভিড় করা গ্রামের মানুষের চোখে শুধুই হাতি। মঙ্গলবার ভোররাতে বাঁকুড়ার জয়পুর জঙ্গল থেকে ট্রাকে চাপিয়ে আনা হয়েছে তিন সুন্দরীকে। সঙ্গে তিনফুটের দাঁত নিয়ে পুরুষ চন্দ্রচূড়ও এসেছে।

'বিকাল পৌনে চারটে নাগাদ এখানে পৌঁছতেই আরাবাড়ির বিট অফিসার অমিতাভ সিংহদেবের সঙ্গে দেখা। উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'আর বলবেন না মশাই, সুন্দরীদের গন্ধ পেয়ে একটা বুনো দাঁতাল একেবারে কাছে চলে এসেছে।' বলতে না বলতেই জড়ো হওয়া গ্রামবাসীরা হই হই করতে করতে বিট অফিসের পিছনদিকে দৌড়লো। কাঁটাতারের বেড়ার পিছনে মাঠ জঙ্গলে দেখা গেল বিশাল হস্তিপুঙ্গব মদমত্ত ভঙ্গিতে ঘুরছেন। দুপুরে পূর্ব মেদিনীপুরের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার প্রদীপ বসু বলছিলেন, 'এখন হাতিদের মেটিং সিজন। এই সময় পুরুষরা হস্তিনীর গন্ধ পায় প্রায় শ'দেড়েক কিমি দূর থেকে।' কথার সত্যতা বোঝা গেল।

'গ্রামবাসীরাও ছাড়বে না। তারা মহা উৎসাহে পটকা ফাটিয়ে দাঁতালকে তাড়াতে ব্যস্ত। গলা ফাটিয়ে চিৎকার চলছে সমান তালে। এতদিন ধরে খেতের ধান নষ্ট করার ফলে হাতির আর দেবত্বের অবশিষ্টও নেই গ্রামবাসীদের কাছে। মেয়ে-বৌ-বাচ্চা থেকে যুবক-বুড়ো—সবাই কাঁচা গালাগাল ছুড়ে দিচ্ছে। অবলা বিশালদেহীর পিছন থেকে অমিতাভবাবু গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছেন, পাথর মার, পাথর।' তারপরেই 'গান চাই, গান কোথায়' বলে বন্দুকের খোঁজে ব্যস্ত হয়ে মোটরবাইক নিয়ে চলে গেলেন

জারবাড়ি রেঞ্জ অফিস থেকে বন্দুক আনতে। কিছুক্ষণ পর গ্রাম-বাসীদের আক্রমায় বিরক্ত হয়ে প্রেমিক-বুনো প্রস্থান করল ঘন জঙ্গলের ভিতরে।

'প্রেমিকের এ রকম অতি আগ্রহ, মুহুর্মুহু পটকার ফটাস ফটাস আওয়াজেও অচঞ্চল চার 'কুনকি'। আপাতত পুরুষ চন্দ্রচূড়ই তিন সুন্দরীর মরদ। তার মাহুত দরবেশ শাহ বাহনের মতই নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, 'উ রকম বুনোকে অনেক দেখছি। কিছু করতে পারবেক না। আমার হাতি বহুত মজবুত।'

'অসমের গৌরীপুর থেকে লক্ষ্মীমালাকে নিয়ে এসেছেন মনোরম বর্মন। তাঁর সঙ্গে অসমের বন বিভাগের কর্মী রঞ্জিত রাজবংশী, কিরণ বর্মন, হরি গোয়ালা এসেছেন। মাহুত মনোরাজ জানালেন 'লালজি রাজার হাতি আছে মুর লক্ষ্মী। হেট্টু বহুত কামর হাতি আছে।'

রিপোর্টারটিকে পরদিনও হাতি বিট থাকার জন্যে লিখতে হয়—

'সঠিক পরিকল্পনার অভাবেই হাতি তাড়ানো অভিযানের প্রথম দিনটি সম্পূর্ণ নষ্ট হল। বুনো হাতি ধরার জন্য শিক্ষিত (কুনকি) হাতিরা টানটান অ্যাটেনশন হয়ে রইল, ভারি ভারি বন্দুক, অগুন্তি পটকা, গাড়ির সারি, লোক-লশকর—সব তৈরি থাকলেও বুনো হাতির পাল কোথায় তার 'পাকা' খবর না-আসায় প্রথম দিনের সব আয়োজন মাঠে মারা গেল।

'মুখ্য বনপাল মজুমদারই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, 'কুনকি'-দের তাজা রাখতে। বুধবার ভোর চারটে নাগাদ অভিযানে বার হতে হবে। সেই মতো মিরগা বিটে হাতিদের খাইয়ে-দাইয়ে রেডি রাখা হয়। গোয়ালতোড় রেস্ট হাউসে রাত্রিবাসের পর পরমেশবাবু এখানে পৌঁছন ভোর সাড়ে পাঁচটায়, তখন থেকে বারবার রেডিও ট্রান্সমিটারে (আর টি) খবর নিতে থাকেন বুনোদের গতিবিধি, অবস্থানের। কিন্তু বুনো হাতির পালের খোঁজ নেওয়ার জন্য সেই রকম কাউকে নির্দেশ দিতেই ভুলে গিয়েছিলেন মুখ্য বনপাল।

'সাড়টা নাগাদ তাঁকে হাতির খবর জিজ্ঞেস করা হলে জানান, 'সাড়ে পাঁচটাতেই ট্র্যাকিং পার্টির কাছ থেকে খবর আসা উচিত ছিল। পাকা খবর কেন যে আসছে না বুঝছি না।' না-বোঝার কথা বলে কেরল থেকে আসা হস্তি বিশেষজ্ঞ জেকব ভি চেরনকে নিয়ে জিপে চেপে চলে গেলেন জঙ্গলে। তারপর থেকে শোনা যাচ্ছিল আর টি-তে পরমেশবাবুর স্বর—'প্যাস্থার ওয়ান কলিং ট্র্যাকিং পার্টি, হাতির পাল কোথায় বলুন।' মিরগা বিটের বনকর্মীরা ওই শুনে তখন মুচকি হাসছেন। একজন বললেন, ট্র্যাকিং পার্টি তো বারই হয়নি, কোথা থেকে খবর দেবে!

'এর পর সারা দিন শোনা গেল হাতির পালের বিভিন্ন অবস্থানের কথা। কেউ বলছেন আরাবাড়ির রেঞ্জ অফিসের পিছনে মহাশোলের জঙ্গলে ১৬টা আছে, কেউ বলছেন লালগড়ের রাস্তায় আছে। গোদাপিয়াশালের জঙ্গলেও একটা বড় পালকে দেখা গিয়েছে বলে কেউ কেউ জানান। এই সব করতে করতে বেলা দেড়টা নাগাদ পরমেশবাবু হতাশ হয়ে ঘোষণা করলেন, আজকের অভিযান পরিত্যক্ত বলে ধরতে পারেন। এই বলেই আড়াবাড়ির রেঞ্জ অফিসে লাঞ্চ করতে চলে গেলেন অফিসাররা। পরে সন্ধ্যায় কলকাতা থেকে আনা জনৈক বন-অফিসার জানান, কাল ভোর পাঁচটার ফের অভিযান আরম্ভ হবে। এবার আগে থেকে ট্র্যাকিং পার্টিকে জানিয়ে রাখা হয়েছে, ভুল হয়নি।

তারপর দিন সাংবাদিকটি যা লেখেন, তা এই—

'বুনো হাতি তাড়ানোর হাঁকডাক-তোড়জোড় দেখে নিম্নপদস্থ বন-কর্মীদের ঠোঁটের কোণে হাসি ঝুলে থাকলেও, মুখ্য বনপাল আজ সঙ্গী-সাথী নিয়ে শেষমেশ দলমার বুনোদের দেখা পেয়েছে। তবে 'হাতি খেদানো' বলতে যা বোঝায় তা একেবারেই করতে পারেননি কলকাতা থেকে আসা উচ্চপদস্থ অফিসাররা। মাত্র ৩টি বড় হাতি ছুটি পটকা ফাটিয়ে, হাতির সাথী ছাড়ানো কাঁটাঝোপে জামাপ্যান্ট ছিঁড়ে, এমনকি সামান্য

আহত পর্যন্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত ক্ষান্ত দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন পরমেশ মৈত্র। কাল তিনি কলকাতা ফিরে যাচ্ছেন।

'সাহেব নিজে হাতি তাড়াবেন' এই নির্দেশে তটস্থ বনকর্মীরা গত এক-দেড় সপ্তাহ ধরেই হাতির পালকে তাড়িয়ে নিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসছিল রঞ্জা। বিটে কিন্তু এখানকার হাতিরা কলকাতার সাহেবের তাড়া খাওয়ার জন্য বসে থাকেনি।

'কে বলে হাতি মূর্খ? এই হাতিরা বুঝে গিয়েছিল দলে ভারী থাকলে তাদেরই বিপদ হতে পারে। কাল রাতে এক অভিজ্ঞ বন-অফিসার এমন একটা ব্যাখ্যা ও আভাস দিয়েওছিলেন। তিনি বলেছিলেন, হাতিরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে যেতে পারে, যাতে তাদের একসঙ্গে ঠেলে ফেরত পাঠানো না যায়। এই দিন ঠিক সেটাই ঘটেছে। হাতিরা 'গেরিলা কায়দা' নিয়েছে। তারা চলেছে নিঃশব্দে, ভাগ ভাগ হয়ে। শিক্ষিত 'কুনকি' হাতির পিঠে চেপে পয়েন্ট ১২ বোর থেকে পয়েন্ট ৪০৪ বোর পর্যন্ত নানা ধরনের বন্দুক-শটগানে সজ্জিত হয়ে 'শিক্ষিত' দলটি ভোর ছটায় এখন থেকে বেরিয়ে মাইল দুয়েক গিয়ে দেখা পায় বুনো হাতির ওই ছোট্ট পালের।

হাতির তাড়ানো দেখতে কুনকিদের পিছনে ছুটে চলা মহাশোল গ্রামের বাসিন্দারা বনকর্তাদের আজকের কাজের নমুনা দেখে দারুণ অসন্তুষ্ট। মঙ্গল সোরেন, কিশোরী সিংহ, জবা সোরেন কিংবা উমাশঙ্কর সিংহ-কেউই বিশ্বাস করেন না যে হাতি দিয়ে হাতি তাড়ানো যায়। একই মত এই অঞ্চলের বিখ্যাত হাতি-তাড়ুয়া পচা মাহাতর। সবাই বলছেন, বনকর্তারা এবার শিক্ষিত হাতি এনে যে খরচ করছেন, সেটা না-করে ওই টাকাটা চার-পাঁচটা গ্রামের মানুষের মধ্যে ভাগ করে দিলে ভাল হত। তা হলে হাজার দুয়েক মানুষ জঙ্গল ঘিরে বুনোদের তাড়িয়ে নিয়ে বিহারে ফেরত পাঠাতে পারত অনেক সহজে। কিন্তু মুখ্য বন-

পালের বক্তব্য, 'চারটে কুনকি দিয়েই বুনোদের তাড়াতে পারব। দক্ষিণবঙ্গেও এরকম নজির আছে।' পরামেশবাবু জানান শুক্রবার ভোর পাঁচটায় বনকর্মীরা ফের অভিযান আরম্ভ করবেন।

'বহু বছর ধরে হাতি তাড়ানোয় অভিজ্ঞ গ্রামবাসীদের সঙ্গে মতের মিল রয়েছে আব্রাবাড়ি রেঞ্জের কয়েকজন অফিসারেরও। দলমার হাতিদের ফেরত পাঠানো বনকর্তাদের 'কম্মো নয়' বলে তাঁরা আজকের অভিযানকে উদাহরণ মানছেন।'

আয়নার জমির ওপর গুলি খাওয়া হাতি শুয়ে। দর্ভপাণি নিজের গভীর থেকে উঠে আসা অনুতাপে বলতে চাইল, আমি তো তোমায় মারিনি। গুলি করি নি।

তুমি তো সঙ্গে ছিলে। তুমি না হস্তি বিশারদ। হাতি জানা মানুষ। তুমি তো আমাদের জানো, আমাদের খাবার নেই। জঙ্গল নেই। এক জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গলে যাওয়ার রাস্তা নেই। সব দখল হয়ে গেছে।

বাইরে জানলার কাচে আবারও টক টক টক টক। ম্যালের সেই ঘোড়াটি কি আবারও ফিরে এলো উড়তে উড়তে? আমি আর পারছি না। আর পারছি না আর পারছি না আমি।

তারপর এক সময় ঘরের ভেতর চন্দ্রাকে, নিজের বিয়ে করা বৌকে এতদিন পর দেখতে পেয়ে দর্ভপাণি অবাক হলো।

তুমি তো আমায় কবেই ছেড়ে গেছ চন্দ্রা।

চন্দ্রা হাসল। সেই হাসির সঙ্গে সঙ্গে ভেসে ওঠা তার গজদাঁতটি দেখতে পেল দর্ভপাণি।

আজও কাগজে তোমার নাম বেরলে, গানের কোনো অনুষ্ঠানের পর—দর্ভপাণি মনে করতে চাইল সেই প্রায় কুড়ি বছর আগের টয়ট্রেন-যাত্রায়, শিলিগুড়ি থেকে পর পর স্টেশন—সুকনা, রংটং, চুনভাটি, টুং, সোনাদা, ঘুম। টয়ট্রেন বাঁক পেরতে পেরতে পেরতে

এগোচ্ছে। প্রতি বাঁকের মুখে হাসি মুখের পাহাড়ি কিশোর, যুবক, শিশু, যুবতী। তখন মে মাস। সেই তো আমার প্রথম দার্জিলিং যাওয়া চন্দ্রাকে নিয়ে। সুকনার পরের স্টেশন কি হবে চন্দ্রার কাছে জানতে চেয়ে উত্তর না পেয়ে 'তিন্ধা'—এইটুকু বলে, নিজের রসিকতায় নিজে নিজেই হেসে ওঠা দর্পপাণির।

টয়ট্রেনের জন্যে পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে অপেক্ষা করা নেপালী ছাত্রদের কারও কারও মুখে মাউথ অর্গান। মেঘ মোড়া আকাশ থেকে এই বৃষ্টি নামে তো এই আলো। সবুজ পাহাড়ের মাথায় মাথায় মেঘ। যেন হাজার হাজার কয়লার উনোনে আঁচ দিয়েছে কেউ। আর তার ধোঁয়া উড়ে আসছে আকাশ চাটতে।

সেবার হিলকার্ট রোডের হলিডে হোমের কেয়ার টেকারটি, লরেন্স লেপচা যার নাম—

'হর রাত মেরা নিদ হরু
চিসো বাতাস লে উড়াইলাঙ্
বিছানি পাখা কো মির মিরে
মলয় সদাই বিন যাউঙ্'

এটা ছিল কোনো প্রেম, হতাশ-প্রেমের গান। লরেন্স গাইত।

রাস্তায় রাস্তায় তখন এত ফরেন লিপস্টিক, বাইনোকুলার, কসমেটিক, চটি আরও কী কী সবের দোকান হয় নি। মেয়েরা রাস্তার ধারে বসে উল-কাঁটায় সোয়েটার টুপি চাদর বোনে। দরাদরির পর বিক্রি করে। ভিখিরিরা ইংরেজিতে ভিক্ষে চায়। তাদের আশে-পাশে লোমঅলা কুকুর।

তখনও ঘিসিং, জি কে এল এফ, হিল কাউন্সিল—কোথাও কিছু নেই। গোর্খা লিগ নামটা শোনা যায়। তার নেতা দেওপ্রকাশ রাই।

হস্তিবিশারদ দর্পপাণি রায়ের সামনে হোটেল-কামরার ভেতর চন্দ্রা আর গুলি হজম করা দাঁতাল পাশাপাশি।

তুমি আমার গান পছন্দ করনি—বলতে বলতে চশমা খুলে ফেলে চন্দ্রা। আবার বসিয়ে দেয় চোখে।

আমি কি চন্দ্রার গানকে ভালোবাসিনি? দর্ভপাণি নিজেকে জিজ্ঞেস করল।

আমি কি হাত্তিদের ভালোবাসি না? নিজেকেই নিজের প্রশ্ন দর্ভপাণির।

আমি কি তোমাকে ভালোবাসি নি চন্দ্রা? দর্ভপাণি যেন নিজেকেই নিজে শোনাল এসব কথা।

কাচের জানলায় পর্দার ওপারে সেই হঠাৎ পিঠে ডানা গজান ঘোড়াটি হয়ত নিজের মুখ ঘষছে। হাতের থ্রিলার বেডকভারে পড়ে গেলে তার শাদা মলাটের ওপর পিস্তলের এমবস করা সোনালী ছবিটি শুধু জেগে থাকে। একটি মথ ক্লান্ত ডানায় দেয়ালে বসে থাকাটুকু পাল্টে নেয়। জানলার কাচে শব্দ বাড়ে।

আর এর মধ্যেই, সেই গুলি বেঁধা হাত্তি, চশমা চোখে চন্দ্রা, বাইরে উড়ে বেড়ান রহস্যময় ঘোড়াকে সঙ্গে নিয়ে হাই তুলতে তুলতে দর্ভপাণির ঘুমে জড়িয়ে যাওয়া। আর ঘুমের ভেতর সেই যে ছাংগু লেক, যা কিনা নাথুলা পাস থেকে মোটে চোদ্দ কিলোমিটার, তারপরই চীন, সেখানে পৌঁছে যায়।

গ্যাংটকের 'নরবুগং' হোটেলের সামনে থেকে এন. বি. মুখিয়ার মারুতি। ঠিক সকাল নটায় ছাড়লে সাড়ে নটায় হনুমানটেক। লোকজন এর ওপর বজরংবলীর মন্দির বানিয়েছে। এখান থেকে আকাশ পরিষ্কার থাকলে নাকি স্পষ্ট চোখে পড়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা। দারুণ ঝকঝকে।

ছাংগু পৌঁছতে বেলা এগারোটা বেজে গেল। বেশ শীত। বারো হাজার সাতশো ফিট ওপরে সাত ডিগ্রি ফারেনহাইট টেম্পারেচর। সার বেঁধে দাঁড়ানো মারুতি, জিপ। সেপ্টেম্বরে বরফ নেই ছাংগুতে। টলটলে জল। তার নিচে ঘাটের কাছে আস্ত পাকা সিঙ্গাপুরী কলা। হলুদ খোসাঅলা কলা, চকচকে দশ বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ পয়সা, একটাকা—সব পরিষ্কার নজরে পড়ে জলের দিকে তাকিয়ে থাকলে। হাত দিয়ে জল ছুঁলে হিম হিম লাগে।

রাস্তায় পরপর মিলিটারি চেক পোস্ট। মারুতিতে ড্রাইভার নিয়ে চার জন, খুব বেশি হলে সঙ্গে একটা বাচ্চা। ব্যস। তার থেকে বেশি হলেই নামিয়ে দেবে। পারমিট পাস করাও, গাড়ির নম্বর দাও। সে এক ঝামেলা।

দু একজন মানুষ। মিলিটারির সবুজ রঙের ভারি ভারি গাড়ি। কানে ট্রানজিস্টার দেয়া গম্ভীর মুখের ফৌজি। আর্মি বেস। মাঝে মাঝেই রাস্তা ভেঙে যাচ্ছে। আর তা সারান হচ্ছে ফৌজি-উদ্যোগে।

আর্মির কফি শপে আড়াই টাকায়, বেশ বড় কাপে বেশি দুধ দেয়া গরম কফি। পারকোলেটর আছে। ফৌজি পাবলিক—সবার জন্যেই এক দাম। সেপ্টেম্বরের ছাংগুতে অনেকটা কলকাতার প্রথম ডিসেম্বরের ঠাণ্ডা। এসব স্বপ্নে ছিল না দর্পপাণির। বরং তার দেখার ভেতর ছিল সেই বিশাল লেকের পাড়ে পুঁতি-ঘণ্টায় সাজান ইয়াক তার পিঠে উঠে ছবি তুলতে পারে বাচ্চারা। আর ইয়াকের পিঠে বসে তাকে ছোটান নিমা নামের ছেলেটি।

ইয়াক ছুটছে! ঘোড়ার মতোই। পিঠে নিমা।

দর্পপাণি জানতে চাইল—এর নাম কি?

উত্তর—গোরু।

দর্পপাণি বলল, গোরু তো বুঝলাম, কিন্তু একে কি বলে? অবশ্য সবটাই দর্পপাণির নিজস্ব হিন্দিতে।

নিমা এবার তার হলদেটে দাঁত বার করে হাসল। বলল, ইয়াক।

সে-ও তো জানি। কিন্তু তোমার নাম কি?

নিমা উত্তর দিল, নিমা।

তোমার নাম যেমন নিমা, তেমনি একে তুমি কি বলে ডাক?

নিমা বলল, ওহো—ছোটু। ছোটু।

দর্পপাণি স্বপ্নে ইয়াকের দৌড় দেখতে পেল।

অনেক অনেক ইয়াক। তার পিঠে নিমা। আরও ঐ রকম অনেকে। এমন পোশাক তো বড় পর্দায় 'চেঙ্গিস খান' ছবিতেই

দেখেছে দর্ভপাণি। মুখও প্রায় সেরকম।

বাঁ দিকে উঁচু পাহাড় উঠে গেছে। তার গায়ে টিন ঘেরা লেডিজ টয়লেট। সেই পাথর আর সবুজের পায়ের কাছে মারুতি, জিপের লাইন। মাঝে পিচ বাঁধান রাস্তা। সেখান দিয়ে অনবরত ফৌজি জিপ, ট্রাক যায়। একটু গেলেই চেক পোস্টের বেড়া ফেলে রাখা আছে। 'শক্তিমান' বা অন্য কোনো মার্কাঅলা ফৌজি গাড়ি এলে আকাশের দিকে উঠে যায়। তারপর আবার নেমে আসে।

বেড়ার ওপারে পাবলিক যেতে পারে না। বেড়ার আড়াল পেরিয়ে কেউ ভেতরে চলে গেলেই গরম ফৌজি ওভারকোট পরা ডিউটিতে থাকা সিপাহি হুইসিল বাজায়। একবার দুবার।

পাহাড় আর সবুজ, মাঝে রাস্তা। ওপারে লেক। এই তো ছাংগু। লেকের পারে ছাংগুশ্বরের মন্দির। ছাংগুশ্বর, নাকি ছাংগুবাবা? ছোট চালা মতো ঘর। ভেতরে বিগ্রহ ফুল ধূপবাতি—সব ঠিক ঠিক মনে পড়ে না দর্ভপাণির। তবু স্বপ্নে ইয়াক দৌড়য়। ঘোড়া দৌড়য়। সামান্য মাথা নামানো, বেঁটে শিঙঅলা ইয়াক। চেহারায় তেমন বড়সড় কিছু নয় কিন্তু তার খুরে শব্দ ওঠে—খট খট খট খট। খট খট।

দর্ভপাণি দেখতে থাকে। দেখতে থাকে। আবার ঘুরে আসে দাঁতাল। ছাংগুর জলের পাশ দিয়ে সেই গুলি বেঁধা হাতিটিও চারপায় দৌড়য়। এবার তার লক্ষ্য দর্ভপাণি। আর তখনই স্বপ্নে সাবুকে দেখতে পায় দর্ভপাণি। পাশে আরও একজন। খালি গা। মঙ্গোল-মুখ। মাথার চুলে জট তারা দুজনে মিলে কি ভাবে যেন ফিরিয়ে নিয়ে যায় দাঁতালকে।

৯। জাদুকাঠি ও পচা মাহাত

শীতে ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ থেকে তাঁরা আসেন। আর দলমার গুটিকয়।

পচা আশতোড়া গ্রামের আকাশে রোদের আভাস দেখতে দেখতে বলে ওঠে। এখন ও ধান পেকে উঠতে দেরি আছে। তারপর কেটে তোলার তোড়জোড়। শীতের আগে আগে তাঁরা একবার

আসবেন। এমন কি শীতেও।

তখন পচা ঢুকে যাবে হাতির পেটের তলায়।

ঢুকে গিয়ে পচা কি করবে!

আশতোড়ার মানুষজন জানে পচার হাতে আছে জাদুকাঠি।

সেই জাদুদণ্ড থাকলে পচাকে হাতি তো কোন ছার, জিন প্রেত ভূত দানো—কেউই ছুঁতে পারবে না।

গ্রামের লোক জানে জাদুকাঠি।

পচার বৌ তারামণি জানে উটা জাদুকাঠি বটেক।

পচা জানে ওটা লোহার রড।

বিপদে পড়লে তা দিয়ে পচা এক ঘা দু ঘা দেয় হাতির মাথায় বাড়ি। হাতি পালায়।

রাগী, পাগলাটে হাতি সামনা সামনি পড়ে গেলে পচা তখন তার পেটের নিচে ঢুকে পড়ে। হাতির চোখটি ছোট। তাই পচাকে খুঁজে না পেয়ে হাতি ঘাড় মাথা নামাবে।

সুযোগ পেয়ে পচা তার চোখে দেবে জোরসে খোঁচা। ব্যস, পালাবে হাতি। দৌড়, দৌড়।

ও পচা, তোমার ছানাদের হাতি-খেদা করবা, যেমন তুমি?

না বাবু। জান নিয়ে টানাটানি।

ও তারামণি, তোমার যে চারটে ছানা, তাদের হাতি-খেদা—

না, না বাবু! মানুষটা চলে যায়। ভয়ে ভয়ে পথ চেয়ে থাকি। এরা খেতের কাজ, চাষের কাজ—এই সব করবে। যদি সাক্ষরতার বাবু দিদিমণিদের কাছে একটু আধটু শেখে—বলতে বলতে তারামণি ঘোমটা টেনে দেয় মাথায়।

'সাক্ষরতা' শব্দটি তারামণির মুখ দিয়ে ঠিক-ঠাক বেরয় না। জিভে আটকে যায়। সে যাক গে। আমরা আবার তারামণিতে ফিরে আসি।

পচা নাকি তন্ত্র জানে, সাধক?

তারামণি মাথা নিচু করে থাকে।

পচা, তুমি নাকি সাধক—হালছাড়া গলায় রিপোর্টারটি প্রশ্ন করে। এখন পর্যন্ত তার খবরের কাগজে খাওয়ানোর মতো কোনো অ্যাঙ্গেল আবিষ্কার করতে পারে নি। এখন সময় নয় হাতি আসার। তবু পচা কীভাবে বেঁচে থাকে এখন! প্রদীপ আবিষ্কার করতে চায়।

কে বলে বাবু?

এই যে সবাই, আশতোড়ার লোকজন। তোমার সঙ্গে যারা হাতি তাড়াতে যায়—বিগুল কিস্কু, মানজা সোরেন, সনাতন বেসরা—তোমার যে জনা পঞ্চাশের দল গো—

তাতো হবেই বাবু। লোক না হলে হাতি খেদান····

পচা রিপোর্টারটিকে চেনে। আগেও দেখেছে কয়েকবার। সেই যে প্রথম যেবার হাতি এলো। বাবুরা অনেকেই ভাবল হাতি এবার হুগলি থেকে সাঁতরে গঙ্গা পেরিয়ে বারাকপুর, মণিরামপুরে ভেসে উঠে তারপর বি টি রোড দিয়ে সিধে ডবল মার্চ করে সোজা চলে যাবে রাইটার্স, বিধানসভা।

মহাকরণ অভিযান—বঞ্চনার প্রতিবাদে, নারী নির্যাতন, ধর্ষণের প্রতিবাদে—কলকাতার দেয়ালে দেয়ালে মাঝে মাঝেই কারা কারা যেন এমন পোস্টার সেঁটে দিয়ে যায়। হাতিরাও কি তাদের খাবার, থাকার জায়গা জঙ্গল চাইতে কলকাতা চলে আসবে? সোজা। হাতিদের মহাকরণ অভিযান!

পচা এতসব গুছিয়ে ভাবতে পারে না। কিন্তু আশতোড়ার এই মাটির ঘরে মাড়ভাত খেয়ে তার ঘুমনোর কথা কলকাতার লোককে জানিয়ে দেন যে রিপোর্টারবাবুটি তার নাম প্রদীপ না কি যেন, এতক্ষণে মনে পড়ে পচার।

প্রদীপ ঘুরতে ঘুরতে এটুকু তথ্য পেয়ে যায়। বহু গ্রামেরই রেশন দোকান বারো-চোদ্দ কিলোমিটার দূরে। রেশনে চাল চিনি গম কখনই একসঙ্গে থাকে না। তাই কে যায় কার্ড করাতে! রেশন তুলতে! আর রেশন কার্ড না থাকলে হুজুর মা বাপ, 'হাতিতে খেয়ে নেয়া আমার জমির ধানের ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করা হোক—এমনটি

আবেদন করা যাবে না। তাই রেশন কার্ডও নেই। ক্ষতিপূরণও হয় না।

ক্ষতিপূরণ তো নয়, ভিক্ষে—আশতোড়ার আশেপাশের অনেকেই এমনটি বলেন।

এতো শীতের যাত্রাপালা। ধান কাটার পর মানুষের হাতে টাকা। কিন্তু এযাত্রা বিনি পয়সায়। বন থেকে হাতি আসে। বাবুরা আসেন পোষা হাতির পিঠে। বুনো তাড়াতে, কুনকি নিয়ে। তারপর ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ। খাওয়া দাওয়া।

প্রদীপ এসব ক্ষোভ তার নোট বইতে জমা করে। কপিতে জায়গা মতো সাজিয়ে দেয়া পর পর।

পচা মাহাতর উঠোনে একটি দুটি শালিক বারে বারে পায়ে পায়ে আসছে প্রদীপের। পচার দীর্ঘ ছায়া পড়েছে উঠোনে।

ও পচা, তোমার চলে কেমন করে ?

চলে যায় বাবু। যেগেসেগে। আমাদের আবার চলা। বলতে বলতে দাঁত বার করে হাসে পচা।

শালিক পাখি দুটোর থেকে একটা হঠাৎই যেন কিচ কিচ করে বলে ওঠে, পচা-বাবার নামে আমাদের নালিশ আছে।

প্রদীপ অবাক হয়ে শালিকদের দিকে তাকাল। পাখিরও অভিযোগ !

হ্যাঁ রিপোর্টারদাদা—শালিক তো পরিষ্কার বাংলা বলে, প্রদীপ বেশ অবাকই হলো।

এবাড়ি রোজ ভাত হয় না। তাই আমরা রোজ রোজ ঠিক মতো ফেলা-ছড়া ভাতের একটু আধটু—

পাই না। পাই না। যেন নেচে নেচে বলে উঠল আর এক শালিক। সঙ্গে সঙ্গে দুটো কাকও একই সুরে কথা বলতে থাকে—আমরা এখানে ভাত পাই না। আমরা এখানে ভাত পাই না।

পচা, তারামণি তাদের চার চারটে ছানা ঐ দুটি পাখিকে অবাক হয়ে দেখতে থাকল। আর প্রদীপ শালিকদের অভিযোগও তার নোট বুকে টুকে নিল।

১০। ভগিনী নিবেদিতার শ্মশানে

ছাংগুর জল থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া উঠে আসছে। দূরে পড়ে আছে রোদ। দেখতে দেখতে সাবু একটি ইয়াকের পিঠে চেপে বসল। পাশাপাশি হাতির পিঠে, জটাচুলো লোকটি—এইটুকু দেখার পরই স্বপ্ন ভেঙে গেল দর্পপাণির। ঘরে আলো জ্বলছে। হোটেলের খাটে ডবল কম্বলের নিচে আমি। হস্তিবিশারদ দর্পপাণি রায়। রাতের খাবার খেয়ে তার ওপর দু পেগ নিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। দেয়ালে আলোর কাছাকাছি আরও অনেক ডানা ছড়ান রঙিন মথ।

মাথার কাছে শাদা মলাটের ওপর সোনালী রঙের পিস্তল ছাপা বইটি পড়ে আছে। আর তখনই জানলায় খট খট খট খট শব্দে একটু চমকেই ওঠে দর্পপাণি। হয়ত সেই পক্ষিরাজ হয়ে যাওয়া, ম্যালের পা-খুঁতো ঘোড়াটি। পর্দা সরালেই কাচের ওপর তার নিশ্বাসের কুয়াশা ফুটে ওঠা টের পাওয়া যায়। কাচের ওপর গোল মতো ফোসকা।

উঠতে আর ইচ্ছে হলো না দর্পপাণির। আর তখনই তার আবারও মনে পড়ে গেল দাঁতালকে। সেই পড়ে থাকা রক্তাক্ত শরীর। চোখের কোণে জল।

তোমাকে খুনের পাপ আমায় লেগেছে কি? দর্পপাণি জিজ্ঞাসায় ছিল।—আমি তো তোমায় গুলি করি নি। বন্দুকে তো আমি কত দিন হাত দিই না। তা হবে, চন্দ্রা চলে যাওয়ার পর থেকেই আমি আর ট্রিগারে আঙুল ছোঁয়াই নি। ফুরিয়ে আসা রাতে দর্পপাণি নিজেকেই নিজে শোনাল।

কাচের জানলায় আবার ঠক। ঠক ঠক। ঠক।

তাহলে কি আবার উড়তে উড়তে ফিরে এলো সেই ঘোড়া!

দর্পপাণি আর একবার তাকাল ঘরের চারদিকে। আলোর নিচে মথেরা তেমনি ছড়িয়ে আছে· সুখ-বিশ্রামে। থ্রিলারের শাদা মলাটে সোনালী পিস্তল একই রকম উজ্জ্বল। ডবল কম্বলের নিচে সুন্দর

আরাম। দর্ভপাণি আর জানলার দিকে তাকাতে চাইল না। একটু বাদেই তার মনে পড়ল কাল ২৯ সেপ্টেম্বর। ভারত বন্‌ধ।

পরদিন সকালে বিছানা ছাড়ার আগে দু চোখে ঘুম লেগেছিল দর্ভপাণির। আকাশে মেঘ নেই। পর্দা সরিয়ে দিতেই ঘরের ভেতর থেকে সূর্যোদয়। কালচে সবুজ পাহাড়ের ওপর সোনার তবক সাজান। দেয়ালের মথেরা কখন যেন উড়ে গেছে। রোজকার মতো সকালে উঠে একটু ফ্রি হ্যাণ্ড একসারসাইজ। তার আগে ভেতরে বাইক পরে নেয়া। খানিকটা গা ঘামানর পর বেল টিপতেই বেড টি। পাতিলেবুর রস দিয়ে চিনি ছাড়া কালো চা।

চায়ের পর বাথরুম। দাড়ি কামানো। গরম জলে চান। পর পর। এরপরই ব্রেকফাস্ট দিয়ে যাবে ঘরে। দর্ভপাণি রায়, হস্তি-বিশারদ মনে করতে পারল ছাংগুতে দেখা বারো হাজার সাতশো ফিট উচ্চতায় ডোমা নামের সেই মেয়েটিব চায়ের দোকান। সেখানে সামান্য পেঁয়াজ-লঙ্কা কুচি ছড়ান এক প্লেট সেদ্ধ মটরদানা, যা কিনা ঘুগনি বলে বিক্রি হচ্ছে, দাম তিন টাকা। কফি পাওয়া যায়। চা। নুডলস। ম্যাগি। ডিমের ওমলেট। অত উঁচুতে ডোমার মতো মেয়েদের আরও দু-তিনটে দোকান। গ্যাংটক থেকে মারুতি চালিয়ে ছাংগুতে ট্যুরিস্ট নিয়ে আসা ছোকরাদের অনেকেই সঙ্গেই তার দিব্যি কস্তি-নস্তির সম্পর্ক।

খালি হাতে ব্যায়াম করতে করতে সব দেখতে পায় দর্ভপাণি, মনে করতে পারে।

বিকেলে ম্যালের থেকে সুপার মার্কেট, বাজারের দিকে নেমে যাওয়ার রাস্তায় সোয়েটার, জ্যাকেট, চটি, বায়নোকুলার, কসমেটিক—আরও কত কি পর পর সাজান। বেশির ভাগ দোকানীই মেয়ে। ট্যুরিস্ট অফিসে পৌঁছতে গেলে অনেকটা খাড়াই রাস্তা ভাঙতে হয়। সেখানে

কাচের দরজার ওপারে মিসেস সুব্বা। মোটা, গোলগাল চেহারা। চোখে চশমা। ভায়োলেট রঙের ফুল হাতা কার্ডিগান। ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক। হাস্যমুখী।

এখানে নিবেদিতা, আই মিন সিসটার নিবেদিতাকে কোথায় পোড়ান হয়েছিল ?

পালিশ করা কাঠের উঁচু বেঞ্চির ওপারে মিসেস সুব্বা। যেমন কলকাতায় ব্যাঙ্কের কাউন্টার। একটু যেন অবাক হয়েই তাকালেন দর্ভপাণির দিকে। পাতলা ছিপছিপে চেহারা, তেমন লম্বা নয়। তাই সেভাবে বয়েস বোঝা যায় না। হস্তিবিশারদের পরনে নীল কর্ডুরয়ের প্যান্ট, পায়ে বিদেশি স্নিকার। ছাই রঙের পুরো হাতা জ্যাকেট। মিসেস সুব্বা দার্জিলিংয়ের ট্যুরিস্ট ম্যাপ খুলে দেখালেন দর্ভপাণিকে মুরদাহাটি কোথাও নেই। নিবেদিতাকে যে শ্মশানে পোড়ান হয়েছিল তার নাম মুরদাহাটি।

মিসেস সুব্বা তাঁর হাতের দুমুখো ডট পেন, নীল আর কালোতে বোঝাতে চান ট্যুরিস্ট ম্যাপের ওপর আসলে কোথায় মুরদাহাটি হবে। তাঁর নীল রিফিলের ছোঁয়ায় দর্ভপাণি বুঝতে পারে ম্যাল থেকে খানিকটা নামলেই তরকারি-মুরগির বাজার। ক্যাকটাস, জুতো, রেডিমেড জামাকাপড়, জ্যাকেট, ফোল্ডিং ছাতা, সঞ্জয় দত্ত, জ্যাকি শ্রফ, মাধুরী দীক্ষিত, শ্রীদেবী, মিঠুন চক্রবর্তী, জুহি চাওলা, শাহরুখ খানের বড় বড় ল্যামিনেটেড ব্লোআপ নিয়ে বসা নানা ধরনের ফেরিঅলা, তারপর সুপার মার্কেটের কাছে নেমে এলে বড়সড় মিষ্টির দোকান একটা। সেখান থেকে ঘুম ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। তারপর তার পাশ দিয়ে অনেক অনেক নেমে যাওয়া—মুরদাহাটি।

ভারত বন্‌ধের সকালে হোটেলে খাবার পাওয়া যাবে, ব্রেকফাস্ট পাওয়ার পর দর্ভপাণি নিশ্চিন্ত হতো, কিন্তু সে অবকাশটুকু না দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে সোজা তেনজিং নোরগে রোড।

১৯১১ সালের ১৩ অক্টোবর দার্জিলিংয়ের রয় ভিলায় সিসটার নিবেদিতা মারা যান। পাশে ছিলেন লেডি অবলা বসু। ভোরবেলা

নিবেদিতা চলে যাচ্ছেন। তাঁর রুগ্ন মুখে সকালের আলো। নিবেদিতা বলছেন, 'দ্য বোট ইজ সিংকিং, বাট আই শ্যাল সি দ্য সানরাইজ।'

বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র আর তাঁর স্ত্রী অবলা বসুর সঙ্গে অনেকবার দার্জিলিং গেছেন নিবেদিতা। সেবার—সেই ১৯১১ সালে তাঁরা ঠিক করেছিলেন ঘোড়ায় চড়ে সন্দাখফু যাওয়া হবে। এসবই বই পড়ে জানা দর্ভপাণির।

দার্জিলিংয়ের চকবাজার থেকে তিন-চার কিলোমিটার দূরে লেবংকার্ট রোড। তারপর লেবং রোপওয়ে। সেখান থেকে আর কিছুটা এগোলে ডান দিকে আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তা। সেখানেই রয় ভিলা। এবাড়ি কিনেছিলেন নাট্যাচার্য দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। হয়ত বা তাঁর পরিকল্পনা ছিল এখানেই ছুটি কাটানোর। সে বাড়িতেই নিবেদিতা চলে গেলেন। দ্বিজেন্দ্রলালও মারা যান দার্জিলিং-য়ে।

ভারত বন্‌ধের দিন তেনজিং নোরগে রোড শুনশান। গো-মাংসের দোকান বন্ধ। কেরোসিন, চাল, ডাল, তরকারির দোকানে তালা।

দর্ভপাণির মনে পড়ল ওখানেই জল রঙের পলিপ্যাকে মুড়ি পাওয়া যায়। এক প্যাকেট মুড়ি দু টাকা। এর মধ্যে একদিন বিকেলে গরম গরম আলুর চপের সঙ্গে মুড়ি খেয়েছি। এক একটা চপ দেড়টাকা।

নিবেদিতা মারা যাওয়ার ওর বাড়িটির নাম হয়ে যায় ভূতবাংলা। ভাবতে ভাবতে নীল কর্ডুরয় প্যান্টের দু পকেটে হাত দিয়ে হাঁটতে থাকে দর্ভপাণি। ডান দিকে অনেকটা দূরে দূরে পাহাড় মেঘ রোদ কুয়াশা। পাহাড়ের ওপর পিলার গেঁথে গেঁথে নতুন নতুন বাড়ির খাঁচা তৈরি হচ্ছে।

গো-মাংসের দোকানের সামনে সেই লোমঅলা কুকুরেরা শুয়ে বসে নেই। আরও এগোলে ডান দিকে বড় বড় আস্ত রুই-কাতলা নিয়ে বসে যে নেপালী যুবক, তার খালি পা। চাপা রঙিন পায়জামায় মাছের রক্তের পুরনো দাগ। একটা শেয়াল রঙের ফুলহাতা জামার ওপর নেভি ব্লু সোয়েটার। মাথায় নেপালি ক্যাপ। মাছ কাটার জন্যে বড় বঁটি নেই। যেমন কলকাতা বা অন্যান্য মাছের বাজারে

থাকে। চপার গোছের দা একরকম। তা দিয়েই আঁশ ছাড়ান, মাছের টুকরো তৈরি করা! মুড়ো চ্যালা করে দেয়া। দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। কি তাড়াতাড়ি হাত চলে। রোজই বেলা বারোটা নাগাদ মাছ চলে আসে। হয় কোনো গাড়ি বাস কিংবা ট্রেনের সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে এরকম প্রতিদিনই হয়।

আজ ভারত বন্ধ। মাছঅলা নিশ্চই আসবেন, দর্পপাণি এমনটি মনে মনে ভেবে নিতে পারে।

আজ ২৯ সেপ্টেম্বর, গ্যাট চুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ভারত বন্ধ। সুবাস ঘিসিং আর তাঁর জি এন এল এফ নিশ্চয়ই বন্ধের সঙ্গে। না হলে এত বন্ধটন্ধ হতো না। ভাবতে ভাবতে হু পকেটে হাত ঢোকান দর্পপাণি আরও খানিকটা এগিয়ে যায়। সেই চিনা' খাবারের দোকান। কাচের শো কেসে নুডলসের প্যাকেট, সসের বোতল। কাঁধের ক্যামেরা-ব্যাগ একটু হড়কে সরে আসতে চাইল। হাত দিয়ে তাকে ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিল দর্পপাণি।

এখানে তো মোমো দেখলাম না রাস্তায়। অথচ গ্যাংটকে টিবেটিয়ান ডিশ—মোমো। পর্ক কিংবা চিকেন। মাংসের পিঠে। চিকেনের একরকম দেখতে, পর্কের আর এক রকম। একটু ঝাল কি টক আচার দিয়ে খাও হোটেল 'তাসি'-র ঘরে। নয়ত লাল মার্কেটের কাছে দোতলায় 'ডিকি' হোটেলের কেবিনে, টেবিলে। সামনে সাজান বার।

মোমোর কথা মনে পড়তেই, জিভে জল এলো দর্পপাণির। বয়েসটা বেড়ে যাওয়ার পর ইদানীং এমন হয়। খাদ্যের নামে জিভে নতুন নতুন লালার স্তর ঢেউ হয়ে উঠে আসে।

একটা প্লেটে কটা মোমো দিত। ছটা না পাঁচটা—ঠিক মতো মনে করতে পারল না দর্পপাণি।

ডান দিকে ময়লা জমানোর ঘর, সরকারি কাঁচা গাড্ডির দোকান, ভাতের হোটেল। উল্টো দিকে ইট-পাথরের দেয়াল। দেয়ালে ফার্ন, বুনো লতা, ফুল। পাশেই বেঁটে কলের পাইপ। এত সকালেও সেখানে জলের লাইন।

এত জলের কষ্ট এখানে। পাহাড়ি ঝোরার জল যেভাবে হোক

পাইপ দিয়ে আনা। আমি তো রোজ জল ফুটিয়ে খাচ্ছি। সবাই বলে দিয়েছে এখানে আসার আগে—কি কশাস। ছিল ডায়েরিয়া হলে আর রক্ষে নেই। সব সময় জল ফুটিয়ে খাবে।

এমনিতে পাহাড়ে এসে জল কম খেতে হয়। তেমন করে তেষ্টাই পায় না। ভাবতে ভাবতে বন্‌ধের দার্জিলিংয়ে একা হাঁটছিল দর্ভপাণি।

আস্তাবলে ঘোড়ারা নেই। ঘোড়াওয়ালারাও না।

ম্যাল প্রায় ফাঁকা। সকালে জগিং, দৌড়, কুকুর হাঁটিয়ে বেড়িয়ে ফেরা, আর যা যা থাকার—সবই আছে। তবে ফাঁকা, কেমন যেন সব ফাঁকা।

আস্তাবলের আশেপাশে ডিম-পাউরুটি, তেলেভাজার দোকানে ঝাঁপে লাঠি।

এসব দেখতে দেখতে গরম জ্যাকেটের পকেট থেকে সিগারেট-দেশলাই এনে ধরিয়ে নিল দর্ভপাণি। ফিলটার উইলস। এখন একটার দাম এক টাকা কুড়ি পয়সা।

দূরে কোথাও দাঁড়কাক ডাকল।

দার্জিলিংয়ে পাতিকাক নেই। দর্ভপাণি লক্ষ করে দেখেছে। দাঁড়কাক বা দণ্ডকাক-ই উড়ে বেড়ায়, বসে থাকে দার্জিলিংয়ে। ভাবতে ভাবতে আনমনে সিগারেটে টান দিতে দিতে হেঁটে যাওয়া দর্ভপাণির।

ম্যালের বেঞ্চিতে বসলে সেই একই ছবি। ডানদিকে মুণ্ডহীন ভানুভক্তের স্ট্যাচু। তার ঠিক পেছন দিকে জে কি থাপা পার্ক। মাথার পেছনে মেঘ-কুয়াশামাখা কাঞ্চনজঙ্ঘা। যদিও চন্দ্রার সঙ্গে সেই বছর কুড়ি আগে দেখেছিলাম কাঞ্চনজঙ্ঘাকে এখান থেকেই,..এক ঝলক—ভাবনার ভেতর সিগারেটে লম্বা করে টান দিল দর্ভপাণি। হাবিব মল্লিক অ্যান্ড সন্স-এর শাটার ফেলা। দোকানের সামনে চিঠি ফেলার লাল ডাকবাক্স। পাশে অক্সফোর্ড বুক অ্যান্ড স্টেশনারির ছাদে গোলা পায়রার ঝাঁক। পাশেই একটি ফাস্ট ফুডের দোকান। তারপরের বাড়িটির মাথায় ডিশ অ্যানটেনা। সবার দরজাতেই তালা।

এই ডিশ অ্যানটেনা ছিল না কুড়ি বছর আগে। চন্দ্রা ছিল। এটুকু ভেবে আবারও সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে দর্ভপাণি আকাশ

কেশর। আকাশের রোদ তেমন জোরের নয়। একজন বয়স্কা ভিখারিণী হাতে জলের মালা নিয়ে দানা ছড়াতে ছড়াতে চলে গেল সামনের দিকে। আর তখনই অক্সফোর্ড বুক অ্যান্ড স্টেশনারির ছাদ থেকে উড়ে উড়ে এলো ঝাঁকবাঁধা পায়রারা। তারা উড়ে বসল। বসে, ডানা ঝাপটে একটু ঘুরে সরে সরে সেই ভিখারিনীর ছড়িয়ে যাওয়া দানা খেতে লাগল।

দু-তিনটে ছোট লোমঅলা কুকুর তাদের মালিকদের আওতা থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে পায়রাদের কাছাকাছি এসে ভুক ভুক করে থমকালে পায়রারা প্রথম প্রথম তাদের তেমন পাত্তা দিল না। তারপর হালকা উড়ানের পর ডানা সামলে মাটির ওপর নেমে এলে কুকুররা দাঁড়িয়ে গেল। তখনই এসে দাঁড়াল সেই কালচে ঘোড়াটি। দৌড়ে বাতিল হয়ে যাওয়া। সামনের ডান পায়ে অল্প চোট। সাবধানে খুঁড়িয়ে হাঁটে।

অল্পদিন হলে ম্যালে এতক্ষণে একটু একটু করে বাজার জমতে থাকে। আঁটি বাঁধা কোয়াশ শাক, পাশাপাশি লাল রঙের মুলো। দুটি জাতের কোনো একটা ফল। প্লাস্টিকের বোতলে, পলিথিন প্যাকেটে দুধ। তা ছাড়া গরম চা, হট কফি। ঘোড়াঅলা। কেউ নেই আর। প্রায় ফাঁকা পড়ে আছে চিড়িয়াখানা আর হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে যাওয়ার রাস্তা।

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে উঠে পড়ার কথা ভাবল দর্পনারি। তখনও নিজের দিকে মাথা রেখে একা একা দানা খেয়ে যাচ্ছে ঘোড়াটি। পায়রারা কখন যেন ডানা ঝাপটে উড়ে গিয়ে বসেছে অক্সফোর্ড বুক অ্যান্ড স্টেশনারির ছাদে।

নিজের ব্যথা পাটি সামলে একটু যেন খুঁড়িয়েই একা একা দানা খেয়ে যাচ্ছে ঘোড়াটি। তার পিঠে রোদ। কাল তো এ ঘোড়াই পক্ষীরাজ হয়ে আমার হোটেলের জানলায় অনেকবার ঠক ঠক ঠক ঠক করেছিল। তার নিঃশ্বাসের কুয়াশা ফুটে উঠতে দেখেছি জানলার কাচে। এখন তার পিঠে ডানার চিহ্নমাত্র নেই। কেমন দিব্যি শোভন, সুখী সুখী ভাব।

দর্ভপাণি উঠে পড়ল। ঢালু রাস্তার দুপাশে আজ আর কোনো দোকান নেই। সেই তিব্বতী বুড়ো যার কাছে নানা ধরনের আংটি, তিব্বতী ঘণ্টা, রূপো বাঁধানো শাঁখ, বৌদ্ধ-যন্ত্র পাওয়া যায়—তাঁকে দেখা গেল না রাস্তার ওপর। তিব্বত থেকে উৎখাত হয়ে আসা তিব্বতী নারীরা জ্যাকেট, ধূপ, জামাকাপড়, জুতোর যে দোকান চালায়, সেটিও বন্ধ।

আবারও মেঘ করেছে। দার্জিলিংয়ে এই এক মজা। এই মেঘ তো ঐ আলো। এই বৃষ্টি তো ঐ রোদ। ক্যামেরায় ব্যাগে ফোল্ডিং ছাতা আছে। তবু একবার নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে হাত দিয়ে টিপে দেখল দর্ভপাণি।

উল্টোদিকের একজন মাঝবয়েসী, এখানকারই হবেন, গায়ে নীল উইনচিটার, হাতে লম্বা ছাতা, ছাতার ওপর একটু ভর দিয়েই সামনে উঠে আসছেন। নামার আগে সামনেই 'ক্যাপিটল' সিনেমা, অনেকটা যেন প্রাচীন দুর্গ, মাথার ওপর ঘড়ি—সেখানে সঞ্জয় দত্তের একটা মারকাটারি ছবি, তবে আজ তাও বন্ধ।

'মহাকাল' মার্কেটের দিকে না গিয়ে বাঁক ঘুরে নিচে নামল দর্ভপাণি। বাঁকের পর বাঁক পেরতে হচ্ছে হেঁটে। রাস্তার কোনো দোকানই খোলা নেই। যে দালালরা মারুতি, জিপের সামনে সন্দাখফু, মিরিক, শিলিগুড়ি বলে চিৎকার করে, তাদের কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। সেই মাল বওয়া কুলিরা, কেমন করে যেন দড়ির কয়েকটা ফেত্তা মাথার ওপর রেখে পিঠ দিয়ে সমস্ত ওজনের ভারটি তুলে নিয়ে কোমর সামান্য বাঁকিয়ে হেঁটে যেতে থাকে, যাঁদের সমতল থেকে আসা মানুষেরা 'দাজু' বলে ডাক দেয় অনেক সময়।

ম্যাল থেকে তেনজিং নোরগে হোটেল যেতে হলে 'দাজু'দের দিতে হয় পনর টাকা। তাদের মুখে প্রায়শই 'ভোক মারি'-র মতো খিস্তি। সঙ্গে কাঁচা গাঞ্জির ঝাঁঝাল গন্ধ।

সিকিমে ছং, থুকপাও বেশ চলে। দর্ভপাণি দেখে এসেছে। আর এই প্রায় ফাঁকা রাস্তার বাঁক ঘুরে নামতে নামতে আবারও যেন চন্দ্রা আর গোয়ালতোড়ের জঙ্গলে গুলিবেঁধা সাঁতালটিকে

সামনেদেখতে পায় দর্ভপাণি।

আমি কি কোনো পাপ ধুয়ে ফেলার জন্যে যেতে চাইছি নিবেদিতার শ্মশানে, যেমনটি জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম মাতৃহত্যার পর পুষ্করতীর্থে একা গেছিলেন। সম্পূর্ণ একা—

দর্ভপাণি তার সামনে গোয়ালতোড়ের জঙ্গলের গুলি খাওয়া দাঁতালটিকে আবারও দেখতে পায়। মরণ-চিৎকার কানের ভেতর গরম শিকের ছ্যাঁকা হয়ে বসে যেতে থাকে। সঙ্গে রাইফেলের ধমকে ধমকে ওঠা।

আমি তো কবেই আমার ম্যান্টন কোম্পানির '৪৭০ বোর-এর সাইডলক রাইফেলটি তুলে রেখেছি। মাঝে মাঝে তেল দিয়ে পরিষ্কার করি শুধু, চালু রাখি।

হাতি চিৎকার করে উঠল। দর্ভপাণি শুনতে পেল—আমাদের জঙ্গল নেই। খাবার নেই। আঃ, ভীষণ লাগছে। খুব কষ্ট হচ্ছে গুলি লেগে।

ঘুম ট্যাক্সি স্ট্যান্ড কেমন যেন নোংরা। সেখানে পৌঁছে আবারও দাঁড়কাকের ডাক শুনতে পেল দর্ভপাণি—ক-ক-ক। গম্ভীর, কর্কশ স্বর।

ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে 'শিলিগুড়ি শিলিগুড়ি, আর মাত্র একজন'-এভাবে চিৎকার করে করে লোক ডাকার কেউ নেই। রাস্তা ফাঁকা। একটি ট্রাফিক পুলিশ পুতুল হয়ে দাঁড়িয়ে।

তার কাছে মুরদাহাটির রাস্তা কোথায় জানতে চাইলে কোনো উত্তর পাওয়া যায় না কথায়। হাত নেড়ে দেখিয়ে দেয়—সামনে।

রাস্তা তেমন চওড়া নয়। কিছুটা গেলে মসজিদ। তার গায়ে বুচার বস্তি। বুচার বস্তির ভেতর পর পর কাঠের বাড়ি। সবই মুসলমানদের। এসব দেখতে দেখতে এগিয়ে যাওয়া দর্ভপাণির। বস্তির ভেতর থেকে ট্রানজিস্টারে মহম্মদ রফির মন কেমন করে দেয়া গলা—'গম্ উঠানে লে কে নিয়ে ম্যায় তো জিয়ে যাউঙ্গা—' ভেসে আসছিল।

কি ম্যাজিক এখনও গলায়। এটুকু ভেবে দর্ভপাণি হাঁটার গতি

বাড়াল। লোমঅলা ছাগল রাস্তার ওপর। মোরগা-মুরগি। এখানে ওখানে জমা জল। তারপরই ধাপ কেটে পাথর আর সিমেন্টের সিঁড়ি তৈরি করা। এই সিঁড়ি নেমে গেছে অনেকটা দূর অব্দি।

দেয়ালে দেয়ালে জি এন এল এফ-এর জোড়া পাতা। কোথাও কোথাও অন্য দলের স্বস্তিকা। এসবই ভোট চেয়ে লেখালেখি। কানে আর ল্যাজে বেশ থ্যাবো থ্যাবো লোমঅলা একটা লাল-শাদা কুকুর এখান থেকে পিছু নিল দর্ভপাণির।

রাস্তায় নেমে আরও নানান বাঁক। হাঁটতে হাঁটতে একটু একটু খিদে পাচ্ছে। দর্ভপাণি দেখতে পেল দূরে সবুজ সবুজ ভ্যালি, খেলনা খেলনা দেখতে কাঠের বাড়ি, পাইন গাছের মাথায় রোদ পড়েছে। আর রোদ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লেপ তোষক চাদর সব এনে দেয় বাইরে। রাস্তায় কলের জলে সোয়েটার জ্যাকেট কাচার উৎসব। কলকাতায় বা অন্য কোথাও প্লাস্টিকের যে জালি দিয়ে আমরা সাবান মাখা গা ঘষি, এখন তো ধুঁধুলের জালি উঠেই গেছে প্রায়, দর্ভপাণি নিজেকেই নিজে শোনাল—তো সেই রঙিন প্লাস্টিকের জালি দিয়ে সাবান মাখান গরম জামা-কাপড় ঘষে ঘষে পরিষ্কার করা। তারপর ধুয়ে শুকোতে দেয়া।

ছাড়া ছাড়া কাঠের বাড়ি। বাড়ির সামনে কুকুর। অল্প জমিতে লেটুস শাকের চাষ। নয়ত কোয়াশ লতা, যা হঠাৎ দেখলে বনধুঁধুলের পাতার কথা মনে হতে পারে। তারপর ডানদিকে একটু নিচু মতো জায়গায় ময়লা তোলার কয়েকটি গাড়ি। সেটুকু পেরলে দুপাশে ফার্নের ঝোপ। ঝাউগাছ। পাহাড়ি লতা। লতার গায়ে রঙিন ফুল। কোয়াশলতা।

মুরদাহাটি আর কতদূর—হিন্দিতে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই মুখের দিকে সামান্য তাকিয়ে আঙুল দিয়ে নিচে দেখায়। ওখানে হিন্দুদের শ্মশান, কবরস্থান যেমন, কাছেই মুসলমানদেরও কবরভূমি।

চলতে চলতে বেশ গরম লাগছে দর্ভপাণির। জ্যাকেট খুলে ফেলতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু তাতে নতুন একটা বোঝা হবে হাতে। তার থেকে গায়ে থাকাই সুবিধে। প্যান্টের পকেট থেকে

রুমাল এনে কপালের ঘাম মুছল দর্ভপাণি।

বুচার বস্তি থেকে পায়ে পায়ে পিছু নেয়া সেই লোমঅলা কুকুরটি কখন যেন সরে গেছে। এখন আর দর্ভপাণির কোনো সঙ্গী নেই। মাঝে মাঝে সাবান, জামা-কাপড়ের বোঝা নিয়ে ঝুরে কোনো ঝোরার জলে কাচতে যাওয়া বা কেচে ফেরা লোকজন। আজ বন্ধ। আজ ছুটি। তাই কাজ সেরে রাখা।

ভক পিচ রাস্তা। দুপাশে বুনোলতার ঘন বুনোন। ম্যাল থেকে হেঁটে মুরদাহাটি পৌঁছতে ঘণ্টা দেড়েক লাগল প্রায়। ডান দিকে ঝোপঝাড় পেরিয়ে খানিকটা গেলেই মুরদাহাটি শ্মশান। শ্বেতপাথরের ফলক, ইটের তৈরি ছোট সমাধি। তার গায়ে মারা যাওয়া মানুষটির নাম। মৃত্যুর তারিখ। হরপ্রকাশ রাই। সহদেব লিম্বু। জন্ম···। মৃত্যু···।

রাই, লিম্বু পদবীর লোকেরা তাহলে সমাধি দেয়। এটুকু জানা হলো দর্ভপাণির। কয়েকদিন আগে তৈরি কোনো কোনো কবরে তখনও জামা-কাপড়, কোটের টুকরো। জলে-রোদে রঙ তখনও জলে যায় নি। কোথাও বা আস্ত একটা কোট নয়ত জ্যাকেট। তখনই লতার ঘন বুনোটের মধ্যে দিয়ে কি যেন একটা চলে গেল সর সর করে। একটু চমকে উঠল দর্ভপাণি।

মাথার ওপর দিয়ে উড়তে উড়তে উড়তে ডেকে গেল দাঁড়কাক—ক-ক-ক।

গোটা মুরদাহাটি জুড়ে এখন রোদ। এখানে ওখানে ঝোপ-জঙ্গল ঘাসের মধ্যে মধ্যে মাথা তোলা পুরনো কবর। আরও একটু এগোলে ডান দিকে ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতি-গম্বুজ। তার কপালে লাগান শ্বেত পাথরের ফলকে লেখা—'হিয়ার রিপোজ দ্য রিমেনস অফ সিস্টার নিবেদিতা (মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল) হুজ ওয়ার্কস ফর ইণ্ডিয়ানস, উইমেন স্পেশালি, মেড হার জাস্ট দ্য উওম্যান ওয়ান্টেড অ্যাট দ্যাট টাইম। অক্টোবর ১৩, ১৯১১।'

তাড়াতাড়ি ব্যাগের চেন খুলে ক্যামেরা বের করে তাক করল দর্ভপাণি। পাসাই পেইনটাক্সের কে থাউজেন্ড মডেল, ১৯৭৪-তে কেনা। আলোর মিটার, লেন্স অ্যাডজাস্ট করতে করতে দর্ভপাণি

দেখতে পেল দু-আড়াই মানুষ সমান উঁচু গম্বুজের ভেতরের দেয়ালে শ্বেত পাথরের ওপর লেখা—'রিপোজ দ্য অ্যাশেস অফ সিসটার নিবেদিতা (মার্গারেট ই নোবেল) অফ দ্য রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ হু গেভ হার অল টু ইন্ডিয়া।'

দর্ভপাণির সারা গায়ে কাঁটা কাঁটা। ইনি সেই ভগিনী নিবেদিতা। যিনি বিপ্লবীদের অস্ত্র কেনার টাকা দিয়েছেন। নিজের দেশ ভেবেছেন ভারতকে। বাগবাজারে মেয়েদের জন্যে স্কুল, আর্ত মানুষের সেবা, এদেশের শিল্প আন্দোলনের পুনরুদ্ধার···

দূরে দাঁড়কাক ডাকল। আকাশে মেঘ।

নিবেদিতার স্মৃতি-গম্বুজের ঠিক পেছনেই বহু ভাষাবিদ, পর্যটক লেখ রাহুল সাংকৃত্যায়ণের স্মৃতি-স্তূপ। দর্ভপাণি পড়তে পারল তার গায়ে হিন্দিতে লেখা, 'মহান পর্যটক, পুরাতত্ত্ববিদ, ত্রিপিটকাচার্য, সাহিত্য বাচস্পতি মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ণ। জন্ম-আজমগড় ১৮৯৩। নির্বাণ ১৪ অপ্রেল ১৯৪৩, কি পুণ্যস্মৃতি কমলা সাংকৃত্যায়ন ইস স্তূপ কো নির্মাণ করায়া।'

মেঘলা আলোয় দূরে দূরে এরকম আরও অনেক ছোট বড় স্মৃতির টুকরো। শ্বেত পাথরের ফলক ইটের গাঁথনি। কোথাও কোথাও শাদা পাথরের ফলকে কালোতে আঁকা মুখ। এরকমই এক মরা মুখের ছবির গায়ে নিজের শক্ত পোক্ত ঠোঁট ঘষছিল বড়সড় দাঁড়কাক। তার চিকন গায়ে মেঘলা লাগা আলো।

নিবেদিতার শেষ বারের চিকিৎসা করেন ডক্টর নীলরতন সরকার। ১৯১১ সালের ১৩ অক্টোবর, শুক্রবার দুপুর দুটোর সময় রয় ভিলা থেকে তাঁর শেষ যাত্রা,—দর্ভপাণি যেন সব দেখতে পাচ্ছিল। এর আগে তাঁকে শেষ দেখা দেখে গেছেন জগদীশচন্দ্র বসু, অবলা বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যক্ষ শশীভূষণ দত্ত, অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ, ডাক্তার নীলরতন সরকার, বিপিনবিহারী সরকার আর তাঁর স্ত্রী, যোগেন্দ্রনাথ বসু, শৈলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, ইন্দুভূষণ সেন, মিস্টার পি এডগার, মিস পিগট, সুরেন্দ্রনাথ

ব্যানার্জি, মৃগেন্দ্রলাল মিত্র, মিসেস সেন, মিসেস হালদার, সুরেন্দ্রনাথ বসু, রায়বাহাদুর নিশিকান্ত সেন, পূর্ণিয়ার সরকারি উকিল, দার্জিলিং অ্যাডভার্টাইজের সম্পাদক রাজেন্দ্রনাথ দে। সব নাম পর পর মনে পড়লনা দর্ভপাণির। কিন্তু এঁরা সবাই তো ছিলেন সেদিন।

রাস্তার দু পাশে নিবেদিতাকে দেখার জন্য অনেক মানুষ। তারপর অনেক সময় নিয়ে হেঁটে হেটে মুরদাহাটিতে পৌঁছলে ফুল মালা গন্ধে সাজিয়ে চিতার ওপর শোয়ান হলো নিবেদিতাকে। তখন বিকেল সাড়ে চারটে। রামকৃষ্ণ মিশনের ব্রহ্মচারী গনেন্দ্রনাথ তাঁর মুখাগ্নি করেন। এ সবই বইয়ের পাতা থেকে জানা। পর পর মনে পড়ল দর্ভপাণির।

আর তখনই মুরদাহাটির শ্মশানভূমিতে সাবুকে একেবারে সামনা-সামনি দেখতে পেল দর্ভপাণি। সাবু, তুমি! এখানে!

সাবু কোনো কথা না বলে দাঁত বার করে হাসল।

তুমি এখানে এলে কি করে সাবু?

চলে এলাম স্যারবাবু।

সেই যে দাঁতাল, যার গায়ে গুলি লেগেছে, সেও এসেছে নাকি তোমার পেছন পেছন?

একথার উত্তর না দিয়ে সাবু শুধু দাঁত বের করে হাসল।

সাবুর গা থেকে দাঁতালদের গন্ধ উড়ে এল কি! ঠিক মতো বুঝতে পারল না দর্ভপাণি।

দূরে দাঁড়কাক ডেকে উঠল।

হুস হুস হুস। হাত নেড়ে কাক তাড়াচ্ছে সাবু।

বার বার এদিক ওদিক তাকিয়েও দাঁড়কাক দেখতে পেল না দর্ভপাণি।

স্যারবাবু, তুমি অ্যাত সব নাম মনে রাখ কী করে গো!

কোন সব নাম?

ঐ যে মেমদিদির সঙ্গে শ্মশানডাঙা অব্দি কারা কারা গেছিল—সকলের নাম।

সব কি মনে থাকে না কি?

কিন্তু বলে গেলে তো পর পর।

আমি কি আর বললাম! আমার মাথার ভেতর থেকে বইয়ের পুরনো একটা পাতা লাফিয়ে নামল মাটিতে। তারপর সেই পাতাই সব বলে গেল গড় গড় করে।

যাঃ তুমি কি যে বল না স্যারবাবু! বলতে বলতে ইটে গাঁথা চৌকো মতো কবর-ঢাকনার গা থেকে একটা আধ পুরনো কোট তুলে নিয়ে গায়ে দিতে চাইল সাবু।

ও কি করছ তুমি!

দেখি না গায়ে হয় কিনা। বলেই দিব্যি সেই কোট পরে ফেলল সাবু।

মানাচ্ছে আমায়?

খুলে ফেল। খুলে ফেল। মড়ার গায়ের কোট। এ কেউ পরে! কেউ দেখে ফেললে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।

কি ভেবে সাবু গা থেকে কোট খুলে রেখে দিল ইটের বেঁটে গাঁথনির ওপর।

আচ্ছা তুমি আসলে কে? তুমি কি আলেকজান্দার কার্দার আবিষ্কার করা 'রিয়েল লাইফ এলিফ্যান্ট বয়'? নাকি আর কেউ? এটুকু বলে দর্ভপাণি আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না স্যারবাবু! কি সব খিটিং মিটিং নাম বলছ। আমি তো পচাদার নাম জানি। আর গণেশবাবার। শীতে পচাদার বড় কষ্ট হয় খোলা মাঠে শুয়ে থাকতে। রাতে ওম পড়ে। কতবার তোমাদের সবাইকে বললাম পচাদার মাথার ওপর একটা তেরপল টেরপল কিছু একটা দিয়ে দিতে। ওরকম শুয়ে থাকলে জ্বর হবে পচাদার। তখন হাতি তাড়াবে কে?

কিন্তু হাতি তাড়াতে গেলে ওভাবে মাঠে তো শুতেই হবে।

সাবুর ঘাড় অব্দি ঝাঁকড়া চুলে শেষ সেপ্টেম্বরের হাওয়া হা ডু ডু খেলছিল। মুরদাহাটির মাথায় বেলা এগারোটার সূর্য। রোদ গরম ছড়ায়।

আমি এবার যাই স্যারবাবু।

যাবে ! বেশ । তা অ্যাতটা রাস্তা এলে কিসে ?

কেন, ম্যালের সেই পা-খুঁতো ঘোড়া । যার পিঠে কেউ চড়ে না । তার পিঠে চড়ে বসলাম । আর আমায় পিঠের ওপর পেয়েই উড়তে শুরু করল ঘোড়া । উড়তে উড়তে উড়তে এই বনধের বাজারে মুবদাহাটি । তুমি ওপরে যাবে না ?

যাব তো । কিন্তু দিনের বেলাতেই, এই খটখটে রোদের ভেতর উড়ে এলো ঘোড়া !

তাতে কি হলো ! আমি এখন যাই । ঘোড়া কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়াবে না । আমাকে আগেই বলে দিয়েছে । পচাদার জন্যে রাতের তেরপলের ব্যাপারটা একটু মনে রেখ স্যারবাবু । বলেই খুব জোরে ছুট লাগাল সাবু ।

ঠিক তখনই খ্যারখ্যারে গলায় ডেকে উঠল দাঁড়কাক । শুনেই চমকে তাকাল দর্ভপাণি । সাবুকে আর দেখা যাচ্ছে না । নিবেদিতার স্মৃতি-স্তম্ভের ওপর পুরনো, জ্বলতে জ্বলতে জ্বলতে নিভে যাওয়া ধূপ কয়েকটি, তার ছাই ।

স্মৃতি-গম্বুজের একটু আগে টিনের শেড । দাঁড়কাকটি উড়ে এবার বসল তার ওপর । দর্ভপাণি নজর করে দেখল রেললাইন যেমন হয়, তেমন লোহার টুকরো দিয়ে পর পর তিনটে চুল্লি । অনেকটা যেন প্যারালাল বার করার জায়গা । সেখানেই দাহ করা হয় ।

আবার দাঁড়কাক ডাকছে ।

একজন মাঝবয়েসী গোর্খা কি নেপালী—সেই পা-চাপা পায়জামা তার ওপর গরম সোয়েটার, আর কোট । মাথায় নেপালী টুপি । তাঁর হাতে জেলে রাখা ধূপের গোছা । হুস হুস শব্দ করে তার সঙ্গে নিজের ভাষার আরও কত কি বলতে বলতে কাক তাড়াচ্ছে লোকটি ।

দর্ভপাণি ক্যামেরা কাঁধে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, আপকা নাম ?

জি, পূর্ণভানু ।

দর্ভপাণি দেখল পূর্ণভানু কথা বলতে বলতেই স্মৃতির ছোট বড় টুকরোর ওপর গন্ধ ওড়ানো ধূপ সাজিয়ে দিচ্ছে । তখনই বডি পোড়াবার উল্টো দিকে একটি শেডের নিচে এক জটাধারীকে বসে

থাকতে দেখল দর্ভপাণি।

ইট-সিমেন্টের তৈরি উঁচু তাকের ওপর বসা দুজন জ্যাকেট আর জিনস পরা ছোকরা। হাফ প্যান্ট পরা শার্ট গায়ে একটা বেঁটে ফর্সা মতো ছেলে তাদের পাশে।

ইট ঘেরা কুণ্ডের ভেতর আগুন। তার ওপর পেতলের সরায় জল। পলিপ্যাকের মুখ কেটে পাত্রে দুধ ঢেলে রাখছে জটা মাথায় মানুষটি।

দর্ভপাণি খানিকটা কৌতূহলে জিনস আর জ্যাকেটদের পাশে বসল। এখান থেকে সোজাসুজি মড়া পোড়াবার জায়গা, নিবেদিতার স্মৃতি-গম্বুজ, তার পেছনে রাহুল সাংকৃত্যায়নের স্মৃতি-ফলকের আভাস —সবই দেখা যায়।

আপকা নাম—দর্ভপাণি চা তৈরি করা মানুষটির সঙ্গে আলাপ করতে চাইল।

অবধূত রামনিবাস গিরি।

একটু ভাঙা কণ্ঠস্বর, হয়ত বা গাঁজার জন্যে। পাতলা হাড় হাড় চেহারা। মাথার জটা কাঁধ ছাড়িয়েছে। খালি গা। গায়ের রঙ বেশ কালো। দু হাতে রুদ্রাক্ষের তাগা। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। ডান হাতে পেতলের বালা।

কিঁউ জি! কেয়া কাম হ্যায়। রামনিবাস জানতে চায়।

নাহি। অ্যায়সে হি। ঠাণ্ডা জবাব দর্ভপাণির।

দুটি শাদায়-কালোয় কুকুর ছানা বারে বারে চলে আসতে চায় আগুনের ধারে। অবধূত তাদের হাত দিয়ে সরাতে সরাতে বলে, হট যাও ভূত গিরি। বুদ্ধু গিরি। দুধ দেঙ্গে হম। তুম লোগোঁ কো দেঙ্গে।

সেই ফাটা ফাটা গলার স্বর। বড় বড় লাল দু চোখ। ময়লা দাঁত।

পূর্ণ ভানু এক গোছা ধূপ রেখে যায় আগুনের পাশে। দূরে দাঁড়কাক ডাকে। ধূপের কড়া গন্ধ মিশে যায় মুরদাহাটির আকাশে।

সিয়ার নে খা লিয়া বাবুজি—অওর দো বাচ্চাকো। ইয়ে দোনো হ্যায়। আভি তো থোড়া বড়া হো গিয়া। বলতে বলতে অবধূত গরম জলে চা পাতা ফেলে।

শেয়ালের দাঁত থেকে বেঁচে যাওয়া বাচ্চারা কুঁই কুঁই-করে।

দর্ভপাণি নজর করে দেখে রামনিবাসের মাথার পেছনে শিব, কালির ছবি। পেতলের গণেশ। আরও কি কি সব ছোট ছোট ধাতুর বিগ্রহ। ঘণ্টা। সিংহাসন।

চায় পিয়োগে বাবু?

দর্ভপাণি ঘাড় নাড়ে—নহি।

আঃ ভূত গিরি, বুদ্ধু গিরি—তুম লোগোঁন কা চাওল হ্যায়—আভি দেতা হুঁ। বলতে বলতে কোত্থেকে যেন একটা স্টিলের বাটির ভেতর খানিকটা ভাত বের করে আনে রামনিবাস গিরি। কুণ্ডের আঁচে পেতলের পাত্রে দুধ ফুটছে, সেই দুধ নামিয়ে এনে সামান্য জুড়িয়ে অল্প একটু ঢেলে দেয় স্টিলের বাটির ভেতর।

দর্ভপাণি জানে সাধুদের পূর্বাশ্রমের কথা জিজ্ঞেস করতে নেই। হয়ত বা সব মানুষেরই পূর্বাশ্রমে নিয়ে বলার ব্যাপারে খানিকটা চাপা-চুপি থাকে।

কিন্তু অবধূত রামনিবাস তো অনেকটাই বলে দিল।

জুনাগড় গিরনারের নাগা বাবা তার গুরু। রামনিবাস দশনামী সন্ন্যাসী। তার ইষ্টদেব দত্তাত্রেয়।

রামনিবাস ভাত খায় না। চাল ফুটিয়ে কাক-কুকুরকে দিয়ে দেয়। পায়রাদেরও খাওয়ায়। সারাদিন শুধু চা। আর সৈন্ধব নুন দিয়ে সেদ্ধ করা সবজি।

রামনিবাস গিরির মাথার পেছনে অনেক ঠাকুর-দেবতার সামনে ধূপের ধোঁয়া, প্রদীপের আলো। রামনিবাস চা খাচ্ছে। সেই জিনস-জ্যাকেট দুজন, হাফপ্যান্ট শার্ট পরা ফর্সা বেঁটে ছেলেটি, পূর্ণভানু—সবাই চা খাবে। অবধূতের কাছে অত গ্লাস নেই। দুজন করে খাবে। তারপর সেই গ্লাস ধুয়ে আবার দুজন।

অবধূত ইট ঘেরা ধুনির ভেতর কাঠ নেড়ে-চেড়ে দিল। ডান হাতে ছোট স্টিলের ক্যারিয়ারে মুখ দিয়ে চা খাচ্ছে, গোঁফ-দাড়ি ভিজিয়ে। আরামের শব্দ আসছে গলা দিয়ে। দুধমাখা ভাত খাচ্ছে বুদ্ধু গিরি, ভূত গিরি। ল্যাজ নাড়ছে।

কাচের বেঁটে গ্লাসে চা খেতে খেতে পূর্ণভানু বলল, বছরে একদিন

কিছু লোকজন, বিদ্যার্থী, সাধুরা আসেন নিবেদিতার এখানে—

আসলে দর্ভপাণি জানতে চেয়েছিল মুরদাহাটি দেখতে কেউ আসে কিনা।

ইয়াদ হ্যায় তো আবাদ হ্যায়।

ভুল গ্যয়ে তো বরবাদ হ্যায়—অবধূত বলল।

তিন মাহিনা আসন লাগাকে য়ঁহা হুঁ। য়ঁহাসে চলা যাউঙ্গা ইলাহাবাদ। অরধ্ কুম্ভ—জানবারি, অগলে সাল।

রামনিবাসের কথা শুনতে শুনতে তার দিকে তাকাল দর্ভপাণি। দূর থেকে আবারও দাঁড়কাকের ডাক ভেসে এলো।

আপ নিবেদিতা কো জানতে হ্যায়—দর্ভপাণি জেনে নিতে চাইল।

আরে ও তো বিবেকানন্দ্ কা চেলি থি—রামনিবাসের জবাব। উত্তর দিয়ে ক্যারিয়ারের সবটুকু চা গলায় ঢেলে দিতে চাইল রামনিবাস। বাকিরা ততক্ষণে চা শেষ করে ফেলেছে। বুদ্ধু গিরি ভূত গিরি দুধ-ভাত শেষ করে ল্যাজ নাড়ছে। একবার রামনিবাসের মুখের দিকে আর একবার স্টিলের ফাঁকা বাটির দিকে চাইছে।

আউর নহি হ্যায়—বলতে বলতে অবধূত সামান্য ঠোঁট ফাঁক করে হাসল।

হালকা করে রোদ উঠে এসেছে আকাশে। কুণ্ডের কাঠ নাড়াচাড়া দিতেই ধোঁয়া, ছাই পাক দিয়ে দিয়ে উঠল ওপর দিকে। চোখ সামান্য বুজে, মুখটা একটা দূরে সরিয়ে নিয়ে অবধূত কাঠ নেড়েচেড়ে আগুন ওসকাতে চাইছে। কাঠ পোড়া গুঁড়ো গুঁড়ো ছাই হাওয়ায় উড়তে উড়তে অবধূতের চুল দাড়ি জটায় লেপ্টে গেল।

ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বার করে ফোকাস করল দর্ভপাণি। শাটার টিপল। শব্দ হলো—ক্লিক। অবধূত হাসল। তারপর নিবেদিতার স্মৃতি-গম্বুজের দিকে লেন্স তাক করতেই এ কি দেখতে পেল দর্ভপাণি রায়। আবারও সেই চন্দ্রার মুখ। গোয়ালতোড় জঙ্গলের গুলি খাওয়া হাতিরাজ, তার লম্বা পুরুষ্টু গজদন্ত, আকাশের দিকে তোলা শুঁড়। এগিয়ে আসছে, ধীরে।

কবে যেন কোনো বিদেশি পত্রিকায় একটি লেখা পড়েছিল

দর্ভপাণি। সঙ্গে ছবি। হাতিদের শাদা শাদা হাড় ছড়ানো সে এক বিশাল কবরভূমি। অসুস্থ বৃদ্ধ হাতি সেখানে ইচ্ছামৃত্যু নিতে যায়। দিনের পর দিন জল, খাবার না খেয়ে অপেক্ষায় থাকে মৃত্যুর। তারপর মৃত্যু এসে গেলে চামড়া মাংস পচে খসে যাওয়ার পর, বহু দিন কেটে গেলে শুধু দাঁত আর হাড় পড়ে থাকে।

ক্যামেরার লেন্সে ফোকাস করতে করতে দর্ভপাণি শুধুই হাড় দেখতে পাচ্ছে চারপাশে। হাড় আর দাঁত অনেক। অনেক। পূর্ণ ভানু, রামনিবাস অবধূত—সকলেরই হাসির শব্দ—হাঃ হাঃ, হোঃ হোঃ হাসি শুনতে পেল দর্ভপাণি। নিবেদিতার শেষকৃত্যের এই জায়গাটি কেমন করে আফ্রিকার কোনো প্রদেশের হাতির কবর হয়ে যায় দর্ভপাণি বুঝতে পারল না। ক্যামেরার ফোকাসে শুধুই হাতির হাড়। হাড় আর দাঁত।

দূরে আবারও দাঁড়কাক ডেকে উঠল।

১১। দাম বিদায়মিছিল

দূরে অন্ধকারে হাতিদের পিঠ পা ল্যাজ দেখা যাচ্ছে। জঙ্গলের নীলচে সবুজ আভা তাদের মেঘ-মেঘ গায়ের ভেতরও ফুটে উঠছে যেন। যেভাবে শান্ত গোরু-মোষ ঘরে ফেরে, তাদের চলনে তেমনই একটা ভাব ফুটে উঠছিল কি? সারা রাত দিন চলতে চলতে তারা কি ক্লান্ত ছিল? খুব ক্লান্ত। তাই পায়ের গতি কমে এসেছে।

নিজেদের টেনে-টেনে-টেনে নিয়ে গিয়ে—এত পথ পরিক্রমার পর শহরের ধুলো, ধোঁয়া, কাঠ পোড়া, টায়ারের আগুনে ছ্যাঁকা খাওয়ার ঘা-ও কারও কারও গায়ে। তবু তাদের শুঁড় আর দেখা যাচ্ছিল না। অনেক দূরে পড়েছিল পচা মাহাত, তার ছলাপাটি, মানুষের হল্লাগুল্লা, সাইকেলে, মোপেডে চেপে হাতি দেখতে আসা মানুষ। তারা কতজন, কতজন! দলপতি হিসেব করতে পারছিল না। তার মাথায় খানিকটা খানিকটা স্মৃতি বসে যায়। আবার বেরিয়েও যায় কিছু। দলপতি ধীরে শুঁড় নাড়ে।

দলের সব চাইতে নবীনতম সদস্যটি দুধ খেতে চাইছিল মায়ের।

দলের অনেকে মাকে আড়াল করে দাঁড়ালে মা দুধ দেবে। এখন বাচ্চাকে আগলে আগলে রাখতে হবে বহু দিন। বাঘের বড় পছন্দ কচি-হাতির মাংস।

গল্প কিন্তু আবারও গোল একটি কাহিনীর দিকে এগোচ্ছে। হাতিরা এসেছিল, তারা ফিরে যাচ্ছে, মাঝে কিছু ঘটনা। এরকম তো হয়ই। এর মধ্যে আবার নতুন কি ?

কিন্তু এরকম তো হলো।

সাবু দাঁড়িয়েছিল মাঠের ভেতর। সে দেখতে পেল হাতিদের ধীরে চলে যাওয়া।

হালকা পায়ে সাবুও হাতির দলের পেছনে পেছনে হাঁটতে আরম্ভ করল। তারপর চলতে চলতে চলতে তার পায়ে ব্যথা। শীতে ফাটা পা থেকে রক্ত পড়ে। গায়ের 'র‍্যামবো' ছাপ গেঞ্জি এক সময় ছিঁড়ে খসে যায়। সাবুর চুলে জট পড়ে। জোনাকি উড়ে উড়ে গায়ে বসে রাতের আন্ধারে।

সাবুর শীত লাগে না। সাবুর খিদে পায় না।

তারপর একদিন সাবু এক ছুটে ঢুকে যায় হাতির দলে। মিশে যায়। তার গায়ের গন্ধ বিপদ আসছে এমনটি মনে করিয়ে দেয় না হাতিদের।

হায়রে মাঠের অলৌকিক জ্যোৎস্না, অন্ধকার—এমনও কী হয়!

এরপর তো সাবুর নামেও গান বাঁধা হবে।

কান্দিরা পাঁচালি গাইবে সাবুর নামে ?

তারপর ?

হাতিরা আরও দূরে নিবিড় সবুজে আবছা হতে হতে এক সময় মুছে গেলে আকাশে চাঁদ জাগে।

পৃথিবী ঘুমোয়।

———